বৈশাখ ১৩২১ সাল।

৫ম বর্ষ—১ম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ।

সূচী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	আত্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি —শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	১
২।	অধ্যাত্ম বিজ্ঞান—অমৃতসেতু —শ্রীযুক্ত তারাদাস চট্টোপাধ্যায় ...	৩
৩।	ভেদাভেদবাদ—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ ...	১০
৪।	সাহিত্য সম্মিলনের দার্শনিক শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস, সি, ম[illegible]য়ের অভিভাষণ ...	১৫
৫।	গোত্র—সম্পাদক	২৫

সমাজ কার্য্যালয়।

৭১নং শাঁখারিটোলা লেন,

কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

বৈশাখ ১৩২১ সাল।

৫ম বর্ষ—১ম সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ।

সূচী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	আত্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি —শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ …	১
২।	অধ্যাত্ম বিজ্ঞান—অমৃতসেতু —শ্রীযুক্ত তারাদাস চট্টোপাধ্যায় …	৩
৩।	ভেদাভেদবাদ—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ …	১০
৪।	সাহিত্য সম্মিলনের দার্শনিক শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস, সি, মহাশয়ের অভিভাষণ …	১৫
৫।	গোত্র—সম্পাদক … …	২৫

সমাজ কার্য্যালয়।
৭১নং শাঁখারিটোলা লেন,
কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা।

প্রকাশকের নিবেদন।

যাঁহার ইচ্ছায় কিছুকাল যাবৎ সমাজ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, এক্ষণে আবার সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছায় "সমাজ" পুনঃ প্রকাশিত হইল। দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিবার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয় ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেও চিকিৎসকেরা দারুণ গ্রীষ্মের কয়েক মাস সর্ব্বপ্রকার মানসিক ব্যাপার হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন, তজ্জন্য তিনি আষাঢ় মাসের পূর্ব্বে বেদান্ত লিখিতে সক্ষম হইবেন না তবে আগামী মাস হইতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইতে থাকিবে বলিয়া আশা করি।

আর একটী আনন্দের সংবাদ

সুপ্রসিদ্ধ পৃথিবী পর্য্যটক, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নহেন, তাঁহার "ভূপ্রদক্ষিণ" নামক পুস্তকখানিই সাহিত্যজগতে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে; সেই প্রবীণ, বহুদর্শী, কর্ম্মবীর চন্দ্রশেখর বাবুর প্রগাঢ় চিন্তাপূর্ণ "কর্ম্ম" নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ শীঘ্রই সমাজে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে। এ সংবাদে পাঠক মাত্রেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। ভরসা করি, সকলেই সমাজকে পূর্ব্ববৎ সস্নেহে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

সমাজ—
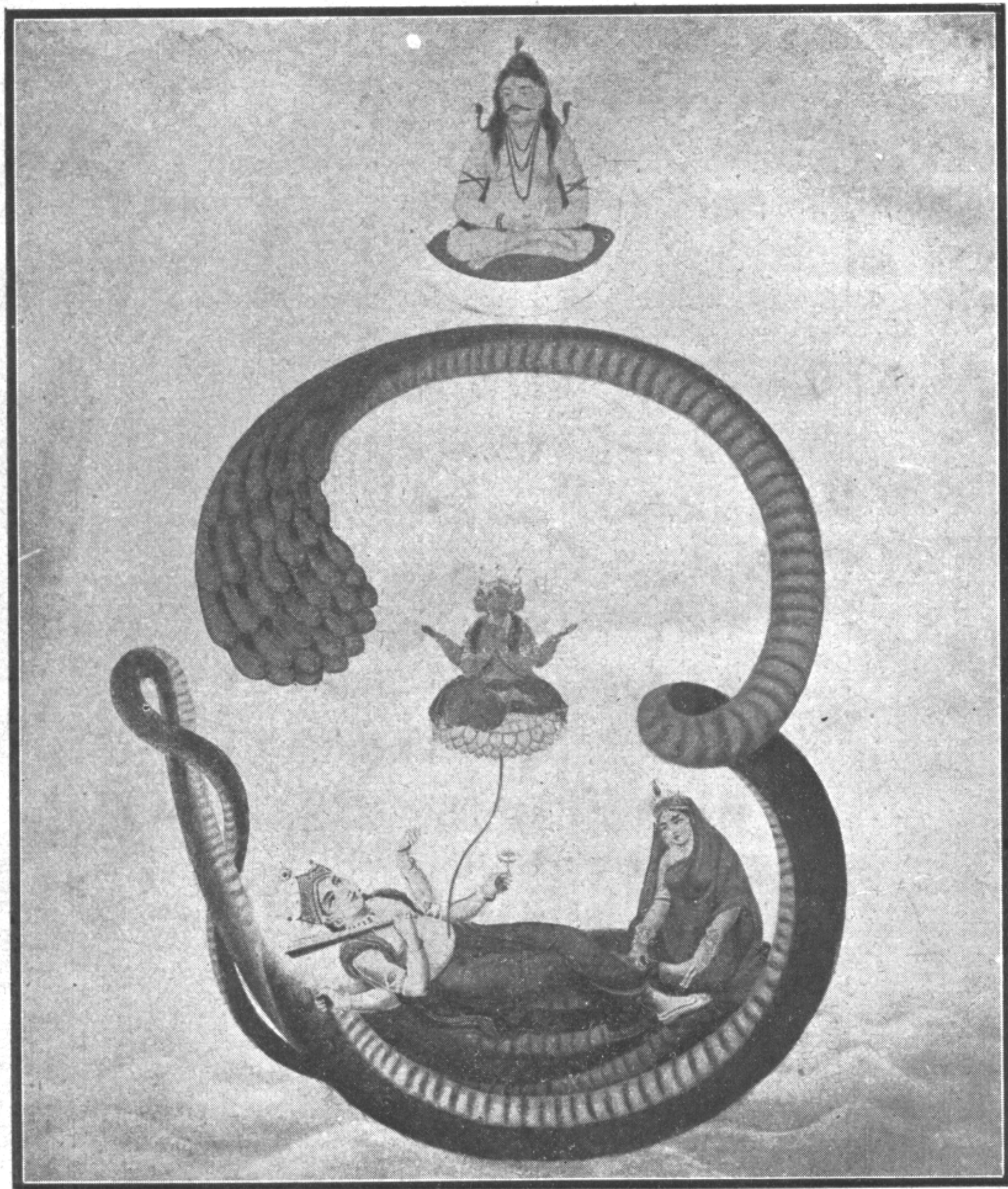
সৃজন বাসনা ল'য়ে ভাসিছ কারণ-নীরে
অনন্ত ফণি-মণ্ডলে ওঙ্কার ধ্বনিছ ধীরে।
হে হরি! নাভি হ'তে সাক্ষীরূপ উদ্ভাসি ব্রহ্মায়,
এক সুর তাল লয়ে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি তায়—
বিকাশে অনন্ত প্রেম সেবাছলে নারায়ণী,
নাদ্ ব্রহ্ম, মূর্দ্ধ শিব তত্ত্ব-জ্ঞান পরায়ণী॥

"উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।	বৈশাখ ১৩২১ সাল।	Vol. V NO. I.

"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি।"

(ভাগবত)

নাশিতে ভেদজ্ঞান মোহান্ধ জীবের

মহাতত্ত্ব করেন প্রচার।

ঋষিরাজ ব্যাসদেব অনন্ত জ্ঞানের

সর্ব্বসাক্ষী অখণ্ড আকার॥

হেরিলেন যতী নিত্য ধ্যানের প্রভায়,

অচিন্ত্য রচনা শক্তি মায়া বিরাজয়,

প্রাণময়ী ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ—

সাজালেন এই বিশ্বরূপ॥

(যে) মহাতত্ত্বে পরমাণু সমষ্টির ন্যায়

অংশ অংশী ভাবে জীবকুল।

অপৃথকত্বের দেয় নিত্য পরিচয়

(যিনি) এ ব্রহ্মাণ্ড সৃজনের মূল—

সর্ব্ব কারণ-কারণ জ্ঞান দীপ্তিমান

যে অখণ্ড একরসে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান,—

অভেদ—সেই নিখিল চৈতন্য স্বরূপ

জ্ঞান—জ্ঞানী বলে "ব্রহ্মরূপ"॥

ত্যজি নিজ নাম-রূপ স্রোতস্বিনী যথা
বিলীনা উর্ম্মিমালী নীরে।
দেহাদি উপাধি জীব বিসর্জ্জনে তথা
সর্ব্ব তত্ত্ব অতীত নিখিলে—
চৈতন্য তত্ত্বেতে সংযত করিয়া মন
লভে অভেদে যে অমৃত আনন্দ ঘন
পরম নির্ম্মল সে অদ্বিতীয় জ্ঞানে
যোগী "পরমাত্মা" ব'লে জানে॥

ভকত কাতর কণ্ঠে দয়ালের কাছে
হৃদয়ের যাতনা জানায়।
জানি তাঁরে "ভগবান" আনন্দের সাজে
নিখিল এ ব্রহ্মাণ্ড আশ্রয়।
ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান
বীজরূপে শক্তি যাঁরে করিছে ধারণ
অতীত হইতে, ভক্তে করে নিরূপণ
সেই ত প্রভু প্রেম রতন॥

ভক্তহৃদি অনুরূপ বিগ্রহ ধরিয়া
দ্বিভুজ চতুর্ভুজ কখন—
কভু শ্যাম, কভু শ্যামা জীবে করি দয়া,
কভু তিনি শিবরাম—
অবতার রূপে পুরালেন মনস্কাম,
ভকত জনের—স্বেচ্ছায় যে প্রাণারাম
অখণ্ড আনন্দ সেই নিত্য জ্যোতিষ্মান্
কর তাঁয় চিত সমাধান।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান—অমৃতসেতু।

আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই ; কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আমরা এমন একটী ইতিহাস জানিতে পারি,যাহা অন্য কোন দেশের ইতিহাস জানাইতে পারে না। প্রাচীন "ঋক" ও তদপেক্ষাও প্রাচীন "নিবেদ" মন্ত্রগুলির প্রতি প্রণিধান করিলে বোধ হইবে, এত প্রাচীনকালের তথ্যনিচয় কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাসে বিদ্যমান নাই। জগৎপূজ্য ব্রাহ্মণগণ পবিত্র বেদের উপসংহার "ব্রাহ্মণ" লিখিয়াই নিরস্ত হইতে পারেন নাই। বেদ প্রধানতঃ যজ্ঞাদির বহুল বর্ণনা লইয়া ব্যস্ত,কিন্তু ঐ সমস্ত যজ্ঞ কি প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হইবে, কি উপায়ে যজ্ঞফল লাভ হইতে পারে, ব্রাহ্মণাংশে তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বেদে পরমেশ্বরের মহিমাসূচক অনেক তত্ত্ব উল্লিখিত থাকিলেও,তাহা শিশুর ভাষার ন্যায় নিতান্ত অস্ফুট—যাহা বুঝিবার জন্য "ব্রাহ্মণে" দৃষ্টিপাত করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বেদে যাহা অব্যক্ত ছিল, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে তাহারই পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছে। সেকালের ঋষিগণ সংসারের সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া স্ত্রীপুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে শান্তিপ্রদ তপোবনে যে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই গবেষণার ফলস্বরূপ পরবর্ত্তিগণ যে তত্ত্বরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, জগতে তাহার তুলনা কোথায় ? তাহা ভাবিলেও বিস্ময়াভিভূত হইতে হয় ! এমন একদিন ছিল, যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল—একাকার অবস্থায় জলমগ্নের ন্যায় ছিল। এই সূর্য্য, এই চন্দ্রতারকাবিমণ্ডিত অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জড়জগৎ কি তখন ছিল ? সে কি ভীষণ অন্ধকার ! অমাবস্যার অন্ধকারের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। তারপর পরমাত্মার সিসৃক্ষায় সেই ভীষণ অন্ধকার অপসারিত হইয়া নূতন সূর্য্যের নবালোকে প্রথমে মানব যেদিন তাঁহার নবীন চক্ষু প্রথম উন্মীলন করিয়াছিলেন—সে কি আনন্দের দিন—কি সুখের দিন—কি চিরস্মরণীয় দিন ! তাঁহারি ইচ্ছায় এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে ; তারপর ক্রমে ক্রমে কত দিনে যে ইহা প্রাণিগণের বাসযোগ্য হইয়া বিশ্বনামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে ? যে সূর্য্যদেব প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথানিয়মে উদিত হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা কত বৃহত্তম কোটী সূর্য্য

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত আছে, কেই বা তাহার সংখ্যা করিবে? আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে সমস্ত তত্ত্ব ভয়ে ভয়ে—সংশয় দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন, প্রাচীন কালের বৈদিক ঋষি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কেমন নির্ভয়ে মনোজ্ঞ পবিত্রভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ যন্ত্র সাহায্যে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছিল, প্রাচীনগণ অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে—মাত্র আত্মবিভূতির সাহায্যে, সেই সমস্ত অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় তত্ত্ব প্রত্যক্ষ দর্শনপূর্ব্বক নানা ছন্দে, নানা ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা যখন সেই বিষয়ে চিন্তা করি, যখন তুলনায় সমালোচনা করি, তখন শরীর পুলকস্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে—ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ সার্থক বলিয়া মনে হইয়া থাকে। জড়ের যদি প্রাণ থাকিত, জড়ের যদি জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তি থাকিত, তবে সেও আমাদের ন্যায় সমস্ত হৃদয় শূন্য করিয়া সমস্তই তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিত। সেও বলিতে পারিত, সেই মহাপ্রাণের নিশ্বাস হইতেই এই ব্যষ্টি প্রাণ স্পন্দন।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ (কঠোপনিষদ)

এই আত্মা সর্ব্বভূতেই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন—প্রকাশ পান না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণ স্বীয় স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব মেবাস্মদ্ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥

ঊর্ণনাভি হইতে যেমন তন্তুসমূহ নির্গত হয়, অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি আত্মা হইতেই সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও বেদসমূহ নির্গত হইয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম, প্রাণ কোথায় নাই? আকাশ—যাহাকে লোকে শূন্যমাত্র বলিয়া জানে, তাহাতেও প্রাণ—মহাসমুদ্রের অতল তলে যাও, সেখানেও এই প্রাণ, অনিলে, অনলে, পর্ব্বতে প্রতি পরমাণু অন্তরালে অনুসন্ধান কর, তুমি দেখিবে, সমস্ত পদার্থের মূলেই এই চৈতন্যের প্রস্ফুরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতের ঋষিসম্প্রদায় এই তত্ত্ব একদিনে বুঝিতে পারেন নাই। সংসারের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া বহু কষ্টে এই অধ্যাত্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা নাই, দলাদলির উপদ্রব নাই,

ভগ্নামী ও উচ্চনীচের কোনও সম্পর্ক নাই। ইহার কি তুলনা আছে? একমাত্র অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই পরম বস্তুকে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং।
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

অধ্যাত্মযোগ অবগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া থাকেন।

যাঁহারা বলেন, আমাদের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা নাই, তাঁহারা যদি এই সকলের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা কোথায় কি ভাবে অবস্থিত! প্রকৃতিতে সাম্য নাই, থাকিতে পারে না। মূলে যখন বৈষম্য, মূল যখন ত্রিগুণাত্মিকা, তখন তাহার মধ্যে প্রকৃত সমত্বের আশা করা বৃথা নয় কি? এ স্থানে তাহার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, সন্ন্যাস—অর্থাৎ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন অধ্যাত্মধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য বোধগম্য হইবার নহে। অস্ ধাতু হইতে ন্যাস পদ সিদ্ধ হইয়াছে; ত্যাগই ইহার প্রকৃত লক্ষণ। সন্ন্যাস ও সত্য এই দুই একই পদার্থ, সত্যও অস্‌ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, সুতরাং সত্যেই সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসেই "সত্য" প্রতিষ্ঠিত। ইহার মূল তাৎপর্য্য জ্ঞান, কেননা সত্য ভিন্ন জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না, আবার সত্য ও জ্ঞান এক মাত্র সন্ন্যাসেই প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ের ন্যাসিগণ ইহার তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জ্ঞানদণ্ডের পরিবর্ত্তে বংশদণ্ড ধারণ করেন মাত্র। উপনিষদ ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" ব্রহ্মে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটী ভাব—যাহা তিনেই এক ও একেই তিন—তাৎপর্য্যকে বোধ করাইয়া দিতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহা যথার্থ জ্ঞান (প্রমাজ্ঞান তাহাই সত্য এবং যাহা সত্য তাহারই মূলে স্বপ্রকাশ জ্ঞান নিহিত। এই জ্ঞান উৎপাদ্য বা আপ্য নহে—স্বতঃসিদ্ধ। অনন্ত বিস্তৃত জ্ঞানরাশি, বিষয়ভেদে ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহাই অভিপ্রায়।

জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত বিস্তৃত জ্ঞানরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, মানব স্বীয় উপাধির আবরণে আবৃত হইয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ

উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছে না। আলোক ও অন্ধকার যেমন একেরই বিকাশ, তদ্রূপ জ্ঞান ও অজ্ঞান সেই একেরই অবস্থা। বাস্তবিক অজ্ঞান নামে জ্ঞানেতর কিছু নাই। জ্ঞানের স্বভাব প্রকাশ—সেই প্রকাশের অভাবই অজ্ঞান পদবাচ্য; নতুবা ইহা যে নাই এমন কথা বলিতেছি না। যিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উচ্চ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল তত্ত্ব নিরীক্ষণ করিবেন, তিনি ভেদাত্মক ভাব পরিহার করিয়া কেবলমাত্র স্বীয় সাধন শক্তি অনুযায়ী এই টুকু বলিতে পারিবেন যে, যিনি জড় দর্শন করেন—তিনি জড়বাদী, যিনি চিজ্জড় দর্শন করেন, তিনি পরিণামবাদী, আর যিনি কেবল শুদ্ধ চিৎ দর্শন করেন, তিনিই বিবর্ত্তবাদী। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে বলিতে হয়, কেবল দর্শন তারতম্যেই "দর্শনশাস্ত্র" সকল এত বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। সমস্ত দর্শনই ঋষি বিরচিত; কিন্তু দর্শন যে পরস্পর বিরোধী, তাহার উপরোক্ত কারণই সঙ্গত প্রমাণ করিয়া দেয়। বেদান্ত যে মায়াবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার মূলেও প্রবল জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। তিনি ভিন্ন যখন দ্বিতীয় কিছুই নাই, জগৎ যখন নামরূপের বিকার—তখন ইহাতে কিরূপে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা থাকিতে পারে? সকল জীবই প্রারব্ধ ক্ষয়ে এই জ্ঞানে জ্ঞানী হইবে—ইহাই বেদান্তের উদার মতবাদ। অসভ্য বন্য সাঁওতালকে জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর কোথায়? সে তথাপি তাহার নয়নযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিবে—ভগবান এক, বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল হইতে জানা যায় যে, ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞানই অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের সহজ সরল ভিত্তিভূমি।

বহির্জ্জগৎ হইতেই এই জ্ঞান সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া, জগৎ হইতেও ইহার সমর্থনসূচক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। জগতীস্থ প্রতি পদার্থের মূলে এমন একটী শক্তি নিহিত আছে, যাহার বলে সকলেই সমভাবে পরিচালিত—একই নিয়মে নিয়মিত। বহির্জ্জগৎ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সরল সত্যকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করে এবং বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপ নিদিধ্যাসন করিয়া ঋষিগণ এই সত্য-টুকু জগৎ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও বলিয়া দেয়। কিন্তু তথাপি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেই অনন্ত শক্তিধরের শক্তির বর্ণনা করা ভাষার সাধ্যাতীত। বিজ্ঞান যেখানে নিরুত্তর, দর্শন যেখানে দৃষ্টিহীন, সেখানে ক্ষুদ্র তুমি আমি কে যে, তাঁহার গাথা গান করিব? শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন;—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাবতুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে॥

তিনি (পরমাত্মা) বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কদাপি জ্ঞেয় হন না। যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে?

ইহাকেই বলে আত্মপ্রত্যয়। এই সহজ আত্মপ্রত্যয়ই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। প্রত্যয় ভিন্ন কি বিশেষ প্রমাণ আছে, যাহাতে তাঁহার পূর্ণ মহিমা দর্শন করিয়া মানব সমস্ত মিথ্যার জালকে ছিন্ন করিতে পারে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদের এই মতকে দৃঢ়তর করিবার জন্য বলিয়াছেন—

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদপ্রবদতামহম্॥ গীতা॥

সকল প্রকার বিদ্যামধ্যে আমি (পরমাত্মা) অধ্যাত্মবিদ্যা। অন্যত্র—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে॥ গীতা॥

ন ক্ষরতি ন চলতি ইতি অক্ষরং। যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি অচল, তিনিই অক্ষরপদবাচ্য। মহর্ষিবর যাজ্ঞবল্ক্য গার্গিকে উপদেশদানকালে বলিয়াছিলেন—"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।" তাহা হইলে বুঝা গেল যে, যাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই,যিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সমানভাবে অনুস্যূত,তিনিই অক্ষর পরমেশ্বর—ব্রাহ্মণগণ ইহাঁকেই অভিবাদন করিয়া থাকেন এবং প্রতি দেহেই যে প্রত্যগাত্মা তাঁহাকেই অধ্যাত্ম বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে যে চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এই অধ্যাত্মবিদ্যাই "বন্ধনচ্ছেদ হেতুত্বাদ্" অর্থাৎ বন্ধনছিন্নের একমাত্র কারণস্বরূপ, যাহার অপর নাম মুক্তিপদ।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে এই অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছিলেন—"বৎস রামচন্দ্র, সেই অদ্বিতীয় স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে দৃশ্যনীয় পদার্থ আর কিছুই নাই।" এইরূপে সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন আর দ্বিতীয় নাই।

অনাদিকাল হইতে প্রবাহধারায় প্রবাহিত মহাদুঃখসমূহের মূল অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞান। এই অবিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত। এক—জ্ঞানের অপ্রকাশাবস্থা, দ্বিতীয়—মিথ্যাজ্ঞান বা ইন্দ্রিয়নিবদ্ধ কুসংস্কারার্জ্জিত জ্ঞান। যাঁহার এই

অজ্ঞানতা দূরীকৃত না হইয়াছে, তাঁহার পুরুষকার কোথায়? মানুষ যে পশু পক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ অজ্ঞানান্ধকারকে অপসারিত করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়া। মন পবিত্র না হইলে, মানসিক বলে বলী না হইলে, আত্মা কাম-ক্রোধাদি দোষে বলহীন হইয়া পড়েন। হিতাহিত জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাঁহার মন ইন্দ্রিয়সুখে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, যিনি কামাদির বশবর্ত্তী হইয়া রিপুর দাস হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার আত্ম স্বাধীনতা নাই ও থাকিতে পারে না; সুতরাং তিনি সমাজে নিয়মের দাসরূপে এবং কর্ম্মে রীতির দাসরূপে সংসারের ভারমাত্র বহন করিয়া থাকেন। আত্মস্বাধীনতা ভিন্ন পুরুষকার অর্জ্জন সম্ভাবিত হয় না—সেইজন্য শাস্ত্রে বারংবার ইন্দ্রিয়গ্রামকে দমন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বহির্ম্মুখী মন দমিত হইলে ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই পুরুষকার অর্জ্জন করিয়া নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারে। যিনি এই জ্ঞানমন্দিরের উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতে না পারেন, শাস্ত্র তাঁহার জন্য ভগবানের নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অনবরত তাঁহার নাম উচ্চারণ ও আরাধনা করিতে করিতে জীব যখন বুঝিতে পারে যে, তিনি ভিন্ন এ জগতে কিছুই সত্য নহে, তিনিই একমাত্র প্রাপ্তব্য—তখনি মলিন জ্ঞান তিরস্কৃত হইয়া প্রমাজ্ঞান প্রকাশ হইয়া পড়ে। সাধক তখন বুঝিতে পারেন যে, "তিনিই" প্রাণের প্রাণ, তাঁহারি শাসনে দিবারাত্রি দ্বারা বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহারই জ্যোতিঃতে সূর্য্যের জ্যোতিঃ, তিনিই সকল প্রাণীর আয়ুর কারণ এবং দেবগণ তাঁহারি উপাসনা করিয়া অমর হইয়াছে। আমরাও যদি তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিয়া তদ্রূপ কার্য্য করিতে পারি, তবে আমরাও দেবতার ন্যায় উচ্চপদ লাভ করিতে পারিব; এমন কি চরমে মুক্তি পর্য্যন্ত অসম্ভব নহে। দেবতার সঙ্গে মানবের প্রভেদ কেবল চৈতন্যস্ফূর্ত্তি লইয়া; সুতরাং চৈতন্যগত মূল একত্ব সর্ব্বজীবেই সমভাবে বিদ্যমান। পুরাণকার একটী হৃদয়গ্রাহী বাক্য বলিয়াছেন যে, "অনিত্য বিষয়ের প্রতি অজ্ঞগণের যেমন প্রীতি, আসক্তি, হে পরমেশ্বর! আমারও যেন তোমার প্রতি তাদৃশ প্রীতি উৎপন্ন হয়।" অর্থাৎ আমার অন্তঃকরণ হইতে তুমি যেন দূরে গমন করিও না। বৈরাগ্যপ্রবণ ভক্তহৃদয়েই ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ। জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহার প্রতি দৃঢ় প্রীতি স্থাপন করিতে পারিলে, এই দুস্তর ভবার্ণব পার হইবার জন্য আর কোন চিন্তারই প্রয়োজন করে না।

বেদান্ত মতে এই আত্মউপাসনাকে কোন কর্ম্ম বা ব্রত বলা যায় না। ইহা কেবল তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানে তাঁহাতেই স্থিতি মাত্র। অনাদি প্রবাহ প্রারব্ধ বশতঃ যখনই অধ্যাস বা ভ্রম আসিবে, তখনই পুনঃ পুনঃ বিচার করিতে হয়। মানবাত্মা নব জন্মগ্রহণে সংসারে মোহে মুগ্ধ হইয়া দেহকেই সার সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকে। এই দেহ-জ্ঞান হইতে ভয় এবং জরা-ব্যাধি-মৃত্যু সেই ভয়ের কারণ হইয়া চিরমুক্ত আত্মাকে পুনঃ পুনঃ সংসার বাগুড়ায় বদ্ধ হইতে হয়। যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ক্ষুদ্র অহং জ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তিনি অদ্বৈতবেদান্তীর ভাষায় বলিতে পারেন ;—

অভয় স্বরূপ আমি, কোথায় আমার ভয়।
জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু, ভূতজ দেহের হয়॥
দ্বাদশ সূর্য্য উদয়ে যদি বিশ্ব দগ্ধ হয়।
আমি সূর্য্য বিশ্ব দগ্ধে কাহার হইবে ভয়॥

ইহাকেই একাত্ম-বিজ্ঞান ও একজ্ঞানে বহু জ্ঞান লয় করা বলে। তন্ত্রের মতেও অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে মহামায়া প্রসন্ন হন না। নরবাচী-রূপ জীবত্বের লয়ে দেবী অতিমাত্রায় দীপ্যমান হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান যুগেও এরূপ সাধকের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে না পারিলে, তাঁহার জন্ম বৃথা বলিয়াই মনে হয়।

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবীচান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
তমেবৈকং জানীথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈবসেতুঃ॥

ইহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জ্ঞান এবং অন্য বাক্য সকল পরিত্যাগ কর। ইনি সংসার-সাগর উত্তরণের কারণ স্বরূপ—অমৃতসেতু।

তমেববিদিত্বাদি মৃত্যুমেতি।
নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়॥

তাঁহাকে অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকে বিদিত হইলেই মৃত্যুমুখ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, ইহা ভিন্ন মুক্তিলাভের দ্বিতীয় পন্থা আর নাই। ওঁ তৎসৎ॥

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়।
নিমতিতা।

ভেদাভেদ বাদ।

(শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ)

—:-*-:—

অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ভেদাভেদবাদ ততদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। অনেকে ইহার নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করেন নাই, যদি বা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তবে ইহার যাথার্থ্য অবগত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইহার প্রবর্ত্তক সনকাদি মহর্ষি ও নারদ। এই মত অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্বৎ সমাজে সমাদৃত। প্রমাণ স্বরূপ আমরা "প্রতিজ্ঞা সিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ" ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্রটীর উল্লেখ করিতে পারি। আশ্মরথ্য এই ভেদাভেদবাদীদিগেরই আচার্য্য। ব্রহ্মসূত্রের অন্যতম টীকাকার নিম্বার্কাচার্য্য ভেদাভেদমতবাদী। ইহা বেদ বিরুদ্ধ নহে—কারণ বেদার্থ প্রকাশই ইহার উদ্দেশ্য, এই মতের মূল উপনিষৎ। উপনিষৎ কামধেনু, যাঁহার যেমন ইচ্ছা, যাদৃশ প্রয়োজন—তিনি সেইরূপই দোহন করেন। সেই উপনিষদ কামধেনুক্ষরিত দুগ্ধামৃত ধারায় কেহ দধি, তক্র, নবনী, ক্ষীর ও আমিক্ষা (ছানা) প্রস্তুত করে, কেহ ঘন রাখে, কেহ জল মিশ্রিত করে, কেহ বা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করে না। আমাদের দার্শনিক মতের মধ্যে কোন্‌টী বিকৃত, কোন্‌টী পরিবর্ত্তিত, কোনটী বা অবিকৃত—এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ মীমাংসা করা বড়ই কঠিন। আমি শঙ্করভক্ত শাঙ্কর দর্শনকেই অবিকৃত বলিব, অনেকেও বলিবেন, কিন্তু হয়ত তুমি বলিবে না। মানবের প্রবৃত্তি নানাবিধ, রুচি বিচিত্রপ্রকার; গ্রহণযোগ্য বুদ্ধিশক্তি অনেকবিধ—কাজেই এক প্রকার মত দাঁড়াইতে পারে না। তবে যাহা সত্য—তাহা চিরদিনই সত্য; কিন্তু এই অসংখ্য মতভেদ-স্তূপের মধ্যে সত্য বাছিয়া লওয়া বড়ই দুরূহ। তবে শঙ্করাচার্য্য দার্শনিকগণের মধ্যে অধিক বুদ্ধি প্রতিভাশালী, অসাধারণ তার্কিক, অসামান্য লিপিকুশলী ও অনন্তসাধারণ শক্তিধর ছিলেন—তাই শঙ্করদর্শনের আজ এত প্রতিষ্ঠা। তবে ভেদাভেদের সমাদর ও প্রতিপত্তি বড় অল্পছিল না, কারণ ব্রহ্মসূত্রকারকে এই মতটী দুষ্ট করিবার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভেদাভেদবাদ পদটির অর্থ দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত। এই মতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য। ভেদাভেদ—ব্রহ্মজীবে ভেদ ও অভেদ

জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথক্‌ভূত, এই কারণে অত্যন্ত ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্ত্তমান। জীবত্বে ভেদ, ব্রহ্মত্বে অভেদ। সর্প কুণ্ডলিত অর্থাৎ কুণ্ডলাকার ধারণ করিয়াছে—এস্থলে ভেদাভেদ। সর্পেরই অবস্থা-বিশেষকে কুণ্ডল বলা হইতেছে—তবেই সেই কুণ্ডলত্বে ভেদ, আবার অস্তিত্বে অভেদ। ইহাই অহিকুণ্ডলন্যায়। এই মতে জীব ব্রহ্মেরই এক দেশ, অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ, সমুদ্র হইতে তরঙ্গ, বৃক্ষ হইতে শাখা—তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জীব। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ এক নহে, আবার সম্পূর্ণ পৃথকও নহে। সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন নহে, আবার অত্যন্ত ভিন্নও নহে। বৃক্ষ ও শাখা এক বা পৃথক নহে। যদি এক হইত, তবে সমুদ্র ও তরঙ্গ, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ বৃক্ষ ও শাখা—এ নাম ভেদ কেন? পর্য্যায় শব্দও বলিতে পারা যায় না। সূর্য্যের প্রকাশ ও তাহার আশ্রয় যে সূর্য্য উভয় ভিন্ন—কারণ আধার আধেয় এক হইতে পারে না। আবার অত্যন্ত ভিন্ন বলিতেও পার না, কারণ তেজত্বে উভয়ের বিভেদ নাই অর্থাৎ উভয়ই ভেদ। সাগর ও তরঙ্গ, বৃক্ষ ও শাখা সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। জীবাত্মা যে ব্রহ্ম হইতে জাত, তাহা শ্রুতি পুরাণাদিতে বিশেষভাবে লিখিত আছে। এই জীবসঙ্কুল বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা প্রতিবিম্ব নহে।

"যথাগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গা সমগ্রাঃ
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং।"

ব্রহ্ম—পরমাত্মা, জীব—জীবাত্মা, আত্মত্বে উভয়েই অভিন্ন। কারণ, আত্মত্ব জাতি, জাতি না মান ধর্ম্ম, ধর্ম্ম না মান উপাধি, এই জাতি, ধর্ম্ম বা উপাধিবশতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব আছে।

জীব ব্রহ্ম যে ভিন্ন—ইহা দ্বৈত মত। এই মতের প্রতিপোষক উপনিষৎ শ্লোক অসংখ্য। "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" এস্থলে ধ্যাতাধ্যেয় ভেদে জীব ব্রহ্মে ভেদ। "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং। গন্তৃ গন্তব্য ভেদে এখানে ভেদ। "যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি" "যিনি সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন।" এস্থলে নিয়ন্তৃ নিয়ন্তব্য ভেদে ভেদ। শ্রুতি—উপনিষৎ পুরাণ; স্মৃতি তন্ত্র—সর্ব্বত্রই জীব ব্রহ্মের ভেদবোধক প্রমাণ অসংখ্য। ব্রহ্মসূত্রেও যে নাই তাহা বলা যায় না, নহিলে উহা হইতে অদ্বৈত বিরুদ্ধ দ্বৈতাদি মত কেন জন্মিল? মাধ্বাচার্য্য প্রমুখ দার্শনিকগণই বা কেন দ্বৈতমতবাদী হইলেন?

"ব্রহ্ম জীব ভিন্ন" এই সম্বন্ধে দ্বৈতবাদীর সহিত অর্থাৎ ভেদাভেদবাদীর ঐক্য আছে। আবার জীব ব্রহ্মে অভেদও বর্ত্তমান—এমতে দ্বৈতবাদীর সহিত বিরোধিতা ও অদ্বৈতবাদীর সহিত একতা আছে। দ্বৈত বা অদ্বৈত এই উভয়ের সামঞ্জস্যে দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ।

শ্রুতি উপনিষদাদিতে অদ্বৈত মত পরিপোষক প্রমাণও যথেষ্ট। যথা—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" "আত্মা বৈ ব্রহ্ম," "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং," "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি," "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যাদি।

তবেই দেখা গেল, শ্রুতি উপনিষদাদি হইতে যেমন দ্বৈত পরিপোষক প্রমাণ অগ্রাহ্য করা যায় না, তদ্রূপ অদ্বৈতমতবোধক প্রমাণও উপেক্ষনীয় নহে। দ্বৈতের অনুরোধে অদ্বৈত মতানুকূল শ্রুতিগুলিকে নিষ্কাষিত বা বিকৃতার্থ করা কিম্বা অদ্বৈতের অনুরোধে দ্বৈত মতানুকূল শ্রুতিসমূহকে অপ্রমাণ বা স্বমতানুকূল করিয়া দাঁড় করান ন্যায্য নহে। যাহা সত্য—দ্বৈত হউক, অদ্বৈত হউক, দ্বৈতাদ্বৈত হউক, তাহাই লোক সমক্ষে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাহা হইলে, কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী উভয়েই স্বমত স্থাপন ও পরমত খণ্ডনের জন্য দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবদ্যোতক শ্রুতিগুলিকে আত্মমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই দু'টানায় পড়িয়া কোন স্থানে শ্রুতির দুর্দ্দশা সহজেই প্রত্যক্ষীকৃত করা যায়। ভেদাভেদবাদী যে স্থলে শ্রুতি দ্বৈতানুকূল বা অদ্বৈতানুকূল—তথায় সেই মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কারণ ভেদ ও অভেদ উভয়ই ইঁহাদের স্বীকৃত।

এই মতে জীব পরমাত্মার বিকার। "বাচারম্ভরণং বিকারো নামধেয়ং," নাম রূপাত্মক তাবৎ পদার্থই বিকার। বিকার বলিয়াই পরমাত্মার সহিত জীব অত্যন্ত অভিন্ন নহে; কারণ দুগ্ধ-বিকার দধি যে দুগ্ধ হইতে অত্যন্ত অভিন্ন—এ সম্বন্ধে সন্দেহই নাই। চৈতন্য এক ব্যতীত বহু নহে—অতএব চৈতন্য রূপত্বে পরমাত্মার সহিত জীব অত্যন্ত ভিন্ন নহে। নতুবা জীবের চৈতন্যাভাব হইয়া পড়ে, অথচ বহু চেতন—ইহাও শ্রদ্ধেয় নহে।

জীব ব্রহ্মের অংশ। বৃক্ষ হইতে শাখা পত্র পুষ্প যেমন বৃক্ষেরই অংশ, জীবও তদ্রূপ পরমাত্মার অংশ। ব্রহ্ম অংশী—জীব অংশ। ব্রহ্ম অবয়বী—জগৎ অংশ অবয়ব।

প্রতিপক্ষবাদী তর্ক উঠাইতে পারেন—"যখন শ্রুতিতে আছে—একাত্মদর্শী "ব্রহ্ম অনেকাত্মক" তবে সাবয়বও অনিত্য। আর যদি "একাত্মক" তবে বিরোধই নাই। "উভয়াত্মক"—ইহাও পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য। ইহা ইহাও বটে, উহাও বটে—এরূপ সঙ্কীর্ণ মত যুক্তিবাদীর গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর একই বস্তু একাত্মক ও অনেকাত্মক হইতে পারে না। প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক উত্থাপিত এই প্রতিকূল তর্ক সহজেই নিরসনীয়। "একাত্মদর্শী মুক্তিলাভ করে," এই একাত্মদর্শিতা ত ভেদাভেদবাদীরই স্বীকার্য্য মত। "নানাত্মদর্শী সংসারে জন্ম মৃত্যু ভোগ করে"—ভেদাভেদবাদী ত বাস্তবিক কেবল নানাত্মদর্শী নহেন; যেহেতু তাঁহারা ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করেন।

উভয়াত্মকতা সঙ্করদোষদুষ্ট ও পরস্পর বিরুদ্ধার্থক বলিয়া ভেদাভেদবাদ নিন্দনীয় হইবে কেন? ব্রহ্মের একত্ব সত্য, অনেকত্বও সত্য। বৃক্ষ এক কিন্তু অনেক শাখা, ব্রহ্মও এক, কিন্তু অনেক প্রবৃত্তি শক্তিযুক্ত। সমুদ্র এক, কিন্তু তরঙ্গাদি বশতঃ নানা; যেমন মৃত্তিকা এক, কিন্তু ঘট শরাবাদি ভেদে নানাবিধ —তদ্রূপ ব্রহ্ম এক হইয়াও অনেক। ব্রহ্মের এই একত্বজ্ঞানেই মুক্তিলাভ ঘটিবে; নানাত্বজ্ঞানে লৌকিক ও কাম্য কর্ম্মাদি ব্যবহার সিদ্ধ হইবে। ভেদাভেদবাদীর একত্বজ্ঞান জন্য মুক্তি ও নানাত্ব জ্ঞান জন্য স্বর্গাদি সংসার প্রাপ্তি। যিনি একত্বদর্শী তিনিই মুক্তিলাভ করিবেন, যিনি অনেকত্বদর্শী তিনি কাম্য কর্ম্মাদিতে অনুরক্ত হইবেন। অধিকারী ভেদ অনুসারে এই "একত্ব নানাত্ব" ব্যবস্থা। তবে আর বিরুদ্ধতা ও সঙ্কর দোষ কোথায়? একই বস্তু একাত্মক ও নানাত্মক হইতে পারে—ইহা ত বৃক্ষ, সমুদ্র, মৃত্তিকাদি প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নানা হেতু নানা শক্তি প্রবৃত্তিক—বস্তুগত্যা ভেদাভেদবাদীরা আত্মার একত্ব স্বীকার করিলেও শক্তির নানাত্ব স্বীকার করেন। শক্তি অনেকবিধ—তদ্রূপ প্রবৃত্তি বা তদধীনা প্রবৃত্তি। কাজেই এই ব্রহ্ম যখন শক্তি প্রবৃত্তি যুক্ত—তখনই নানাত্মক, নতুবা এক। ভেদাভেদবাদী উপনিষদুক্ত নানাত্মদর্শী নহেন। শত শত স্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে বহির্গত হয় ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; অথচ এই স্ফুলিঙ্গ অগ্নিরই অংশ মাত্র—তজ্জন্য অগ্নি হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই বলা যায়।

আর জীব জগতের সত্তা ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যদি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা একাত্মক হইতেন, তাহা হইলে এই জীবজগন্ময় নানাত্ব সম্ভব হইত না। অথচ এই

নানাত্ব সর্ব্বজনগ্রাহ্য। এই নানাত্ব সত্য—তাই কর্ম্মকাণ্ডের প্রামাণ্য, শ্রবণ মননাদির সার্থক্য; তজ্জন্যই এই নানাত্বময় সংসার, উচ্ছিন্ন হয় না। যদি একত্বই সত্য, নানাত্ব মিথ্যা হইত, তবে জগতে একমাত্র সৎ পদার্থ আত্মা বা ব্রহ্মই থাকিত; এই জীব-জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। নানাত্ব আছে—তাই বিধিনিষেধ প্রতিপাদক বলিয়াই শাস্ত্রের প্রামাণ্য—আর এই প্রামাণ্য ভেদ জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে। এই ভেদজ্ঞান না থাকিলে শাস্ত্র যে ব্যাহত হইবে। মোক্ষশাস্ত্র স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া বিধিনিষেধ প্রতিপাদক নহে—অতএব উপনিষৎ শাস্ত্রের প্রামাণ্য অব্যাহত রহিল, ইহা বলিতে পার না, কারণ শ্রবণকালে শিষ্যগুরুভেদ, মনন সময়ে কর্ত্তাক্রিয়াভেদ, নিদিধ্যাসন অবস্থায় ধ্যেয়ধ্যাতৃভেদ ত অপেক্ষিত হইবেই। মোক্ষশাস্ত্রেও শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদিও ভেদাপেক্ষ। উপাসনাকালেও জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম হইতেই জাত হইয়াছে, ব্রহ্মেই লীন হইবে—এখানেও ভেদের অপেক্ষা। এই ভেদ যখন কিছুতেই অপলাপ্য নহে, তখন জীব ব্রহ্মের সত্যতা স্বীকার্য্য। এই ভেদজ্ঞানের উপরই সংসার, বৈদিক লৌকিক জ্ঞান, যাবতীয় ব্যবহার। আবার অভেদও স্বীকার্য্য—নতুবা জীবকে ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত ভিন্ন বলিলে প্রত্যেক জীবকে নিত্য বলিতে হয়। আমাদের স্রষ্টা পরমেশ্বর—এই সর্ব্বজন সিদ্ধ ধারণা লোপ হইয়া যায়। অসংখ্য জীবাত্মা অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী—তাহাদের জন্ম ঈশ্বরানপেক্ষ (ধর্ম্মাধর্ম্ম অদৃষ্টাপেক্ষ—ঈশ্বরাপেক্ষ নহে) হইয়া পড়ে। এইরূপ ব্যাপক পরমাত্মা, কোটি জীবাত্মাও ব্যাপক—ইহা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ। পারিভাষা কণ্টকক্ষত চরণ ঘটত্ব পটত্বময়, বাগ্মিতা মুখর নৈয়ায়িকের কুশাস্ত্রীয় বুদ্ধিগম্য হইতে পারে, কিন্তু সরল যুক্তিবাদী, অনুভববিৎ দার্শনিক বুদ্ধিগম্য নহে। জীব পরমেশ্বর সৃষ্ট নহে, অন্তিমে পরমেশ্বরে লীন হইবে না—ইহা মনে করিতেও আস্তিকের প্রাণ কম্পিত হয়! ভেদাভেদবাদ বরং অদ্বৈতবাদকে আলিঙ্গন করিতে পারে, কিন্তু এতদ্বিধ ঈশ্বর মাহাত্ম্য লোপ-কারী দ্বৈতবাদী হইতে লক্ষ যোজন দূরে থাকিতে চায়।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদিগের মত সংক্ষেপে দেখান হইল। কোন মত সত্য, কোন্ মত যুক্তি নির্ণীত, ইহা প্রতিপাদন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আজিকালি-কার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে এই তাদৃশ অপ্রসিদ্ধ বা তাদশ অপ্রচলিত "ভেদাভেদবাদ" উপস্থাপিত

করিলাম। তবে, এটুকু বলিতে পারা যায়, ইহা উপেক্ষনীয় নহে। কারণ, অদ্বৈতবাদ যাহাকে ব্যবহার দশা বলেন, অবিদ্যাকল্পিত ভ্রান্তি মাত্র মনে করেন, ঔপাধিক ভেদ অঙ্গীকার করেন, ভেদাভেদবাদ মতে তাহা কোন অংশে স্বাভাবিক, কোন অংশে ঔপাধিক ; ব্রহ্ম ও জীবাত্মায় বা জীবাত্মায় জীবাত্মায় প্রভেদ ঔপাধিক স্বীকৃত হইলেও শরীরাদি জড় জগতের সহিত ভেদ স্বাভাবিক বলিয়া উল্লিখিত। ইহাই গুরুতর বিশেষত্ব।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য, শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের সদৃশ যদি কোন ইহার ভাষ্যকার দাঁড়াইতেন—তাহা হইলে ইহা খুবই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, এই মতের সম্প্রদায় তাদৃশ প্রবল ছিল না, কাজেই ভাষ্য টীকাকারগণের দ্বারা পরবর্ত্তীকালে এই চিন্তার সম্যক্ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে নাই। আর যাঁহারা অদ্বৈতমতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্, অদ্বৈতমতই জগতে একমাত্র সত্য মত বলিয়া বিশ্বাসশীল—তাঁহাদিগেরও এই ভেদাভেদাদি মতগুলির অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। অদ্বৈতমতের প্রতিকূল মতগুলির সম্যক্ আলোচনা ব্যতীত অদ্বৈত মত সুদৃঢ় হইতে সুদৃঢ় হইবে কি করিয়া ?

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং
"নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

সাহিত্যসম্মিলনের দার্শনিক শাখা সমিতির সভাপতি

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস্ সি, মহোদয়ের অভিভাষণ। *

সভ্য মহোদয়গণ!

আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সুধীগণ যখন আমাকে আপনাদের এই সাহিত্যসম্মিলনের দার্শনিক শাখার সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন আমি প্রথমতঃ সে প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আমি নিজের চিন্তা ও অধ্যয়ন লইয়া জগতের এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকি, সভাসমিতির সম্পর্কে আসিয়া নিজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার চেষ্টা যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়াই থাকি ; সুতরাং

---

* বিগত ২৮শে চৈত্র কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

আমাকে এই সম্মিলনক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া কাহারও যে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি থাকিতে পারে, এ কথা কখনও আমার মনে আসে নাই। বিশেষতঃ আমি দুঃখের সহিত অনুভব করিয়া থাকি যে, আমি কখনও আপনাদের ন্যায় মাতৃভাষার সেবা করিয়াছি বলিয়া গৌরব করিতে পারি না। তবে আমারই জীবনকালের মধ্যে বাঙ্গালাভাষা যে অতি আশ্চর্য্য দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা আমি আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। নানা কোলাহলের নিম্ন দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যে স্রোতটি বহিয়া যাইতেছে, তাহার আবেগ ও উচ্ছ্বাস আমি আশার সহিত অনুভব করিয়া থাকি। বাঙ্গালাভাষার উন্নতিতে যাঁহারা সহায়তা করিতেছেন তাঁহারা বরেণ্য; যাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে এই ক্ষীণ আলোকটি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, মাতৃভাষার সেই একনিষ্ঠ সেবকগণ বঙ্গবাসীমাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতেন, তাহা হইলেই যোগ্য এবং শোভন হইত। মাতৃভাষার উপাসনা-মন্দিরে পৌরোহিত্য করিবার অধিকার আমার নাই। আপনাদের যত্নার্জ্জিত স্বাভাবিক নেতৃত্ব আজ আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আপনারা যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগের নিকটে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও যে একটি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ভুলিলে চলিবে না। যাহাতে আপনাদের নির্ব্বাচন কোনও বিষয়ে নিন্দনীয় না হয়, এইক্ষণ সেই ব্যবস্থা করিয়া অদ্যকার এই অধিবেশন সার্থক করুন। সভার কার্য্যে সহায়তা করিয়া আপনাদেরও দায়িত্ব পূরণ করুন, ইহাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ।

আমার মনে হয় যে অদ্যকার দার্শনিক বিভাগের অধিবেশন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের দেশের চিন্তার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দার্শনিক সাহিত্য সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের সহিত চিরকাল মিশ্রিত, জড়িত হইয়াই রহিয়াছে। ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক সত্যের সহিত দর্শনশাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের এবং অনুশীলন প্রণালীর যে যথেষ্ট স্বতন্ত্রতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আপনারা সাধারণ সাহিত্য হইতে দার্শনিক সাহিত্যকে পৃথক করিয়া যে ইহাকে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পার্শ্বে একটি স্বতন্ত্র

গোরক্ষপুরের যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ
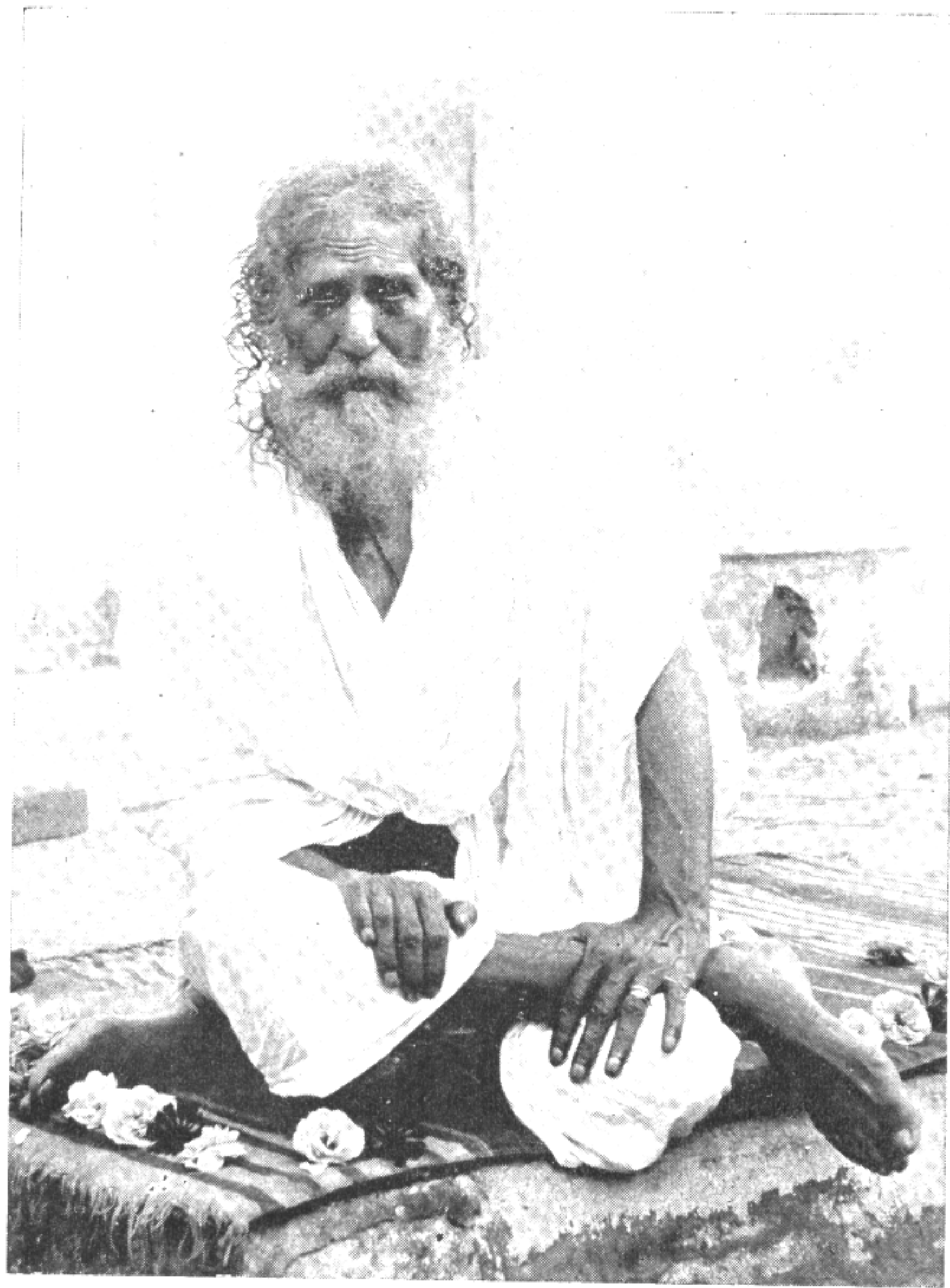
বাবা গম্ভীরনাথ।

স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আজ যে আমরা একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক শাখার ছায়ায় সম্মিলিত হইতে পারিয়াছি, আমি মনে করি যে ইহাই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোনও জাতির সাহিত্যই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। চিন্তাশীলতা বা ভাবুকতাই আবার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান। ভাষাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া রাখিতে পারেন, কল্পনা দিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব-শ্রীসমন্বিত করিতে পারেন, কিন্তু একমাত্র চিন্তাশীলতাই ভাষাকে গাম্ভীর্য্য ও শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে পারে। এক দিকে কোমল কাব্যকলার দিকে যেমন আমাদের মন স্বতঃ আকৃষ্ট হয়, তেমনই দর্শনের সারবান্ বিচার ও মীমাংসার দিকেও একটি আকর্ষণ ক্রমশঃ আমরা অনুভব করিতে থাকি। সাহিত্য-কাননে বিচরণ করিতে করিতে ফুলের শোভায় যতই আমরা প্রলুব্ধ হই, ফলের আস্বাদ পাইবার জন্য ততই আমাদের আগ্রহ হয় না কি? ভ্রমণ করিতে করিতে যখন আমরা একটি পুষ্পোদ্যান-শোভিত নির্ম্মল স্বচ্ছ নদীর তীরে গিয়া উপনীত হই, তখন সে দৃশ্য আমাদের মনোরম বোধ হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া কি ইচ্ছা হয় না যে অদূরের পর্ব্বতশ্রেণীর উপর গিয়া একবার চতুর্দ্দিকের বিশ্ব ভাল করিয়া দেখিয়া লই।

জগতের সমস্ত সাহিত্যেই দর্শনের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সাহিত্য মানবের চিন্তাকেই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং চিন্তা যেমন বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়া কাব্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে আপনাকে প্রকাশ করে, তেমনই দার্শনিক আলোচনার মধ্যেও ইহা তৃপ্তি ও পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে বঙ্গসাহিত্যেও এই সর্ব্বতোমুখী উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যেই বোধ হয় এ দেশের সাহিত্যের বেশী উন্নতি হইয়াছে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্য উত্তরকালে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ পরিষদের নাম যে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল দার্শনিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও আমাদের দেশের সাহিত্যের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কাব্য উপন্যাস ও ইতিহাসের সঙ্গে দার্শনিক সাহিত্যও পরিপুষ্টির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া উপন্যাস-রসিক বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মনস্বী লেখকই দার্শনিক সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। জীবিত লেখকদিগের মধ্যে অনেকের রচনার সহিত আমি পরিচিত নহি; সুতরাং কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব, এই আশঙ্কায় ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে আপনাদের নিকট উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি যেরূপভাবে দার্শনিক সত্যগুলিকে বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ। এইরূপ আদর্শ অনুসৃত হইলে বঙ্গভাষায় দার্শনিক আলোচনার বহুল প্রচার হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদিগের মধ্যে অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও অনুসন্ধান প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গভাষায় একটি বিস্তৃত দর্শন-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে। যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত, তাঁহারা সকলেই বঙ্গভাষার সেবক নহেন, কিন্তু যাঁহাদের সুযোগ এবং শক্তি আছে, তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রতিভা এই দিকে নিয়োজিত করিলে অনেক সুফলের সম্ভাবনা।

আমার মনে হয় যে, বঙ্গভাষায় দর্শন চর্চ্চার উন্নতি হইতে হইলে এই শ্রেণীর লোকের দ্বারাই হইবে। ইঁহারা মুখ্যভাবে বঙ্গভাষার লেখক না হইলেও ইঁহাদের হস্তেই দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধারণ সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলেও আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। বর্ত্তমান কাব্য বা উপন্যাস সাহিত্য যে সাধারণতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারাই উন্নতিলাভ করিয়াছে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালে যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহারা দেশীয় চিন্তা, সমাজ ও ইতিহাসকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন; সাধারণ সাহিত্য যেরূপ পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে অগ্রসর হইয়াছে, বাঙ্গলার শিশু দার্শনিক সাহিত্যও সেইরূপ আপাততঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা সংস্কৃতের বিপুল দার্শনিক সাহিত্য ও ইয়ুরোপীয়

চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারাই বঙ্গভাষায় দার্শনিক সম্পদ্ বাড়াইতে পারিবেন।

দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে পরিভাষার অভাব দূর করিতে হইবে। বাঙ্গালায় কোনও দার্শনিক আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই শব্দের অভাব অনুভব করিতে হয়। বঙ্গ সাহিত্যের শব্দ সম্পদ্ যে এখনও আশানুরূপ বর্দ্ধিত হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই শব্দ-সম্পদ্ বাড়াইয়া না লইলে দর্শনের ন্যায় গম্ভীর ও জটিল বিষয়ের আলোচনায় পদে পদে ভাষার দৈন্য অনুভব করিতে হয়। এ সম্বন্ধে হয়ত আপনারা বলিবেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকিতে আমরা ভাষার দৈন্য স্বীকার করিব কেন? কিন্তু আমার বোধ হয় এইখানে একটু উদারতা থাকা চাই। জ্ঞানের সাম্যনৈতিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা থাকা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার নিকটে প্রয়োজন হইলে ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। অবশ্য সংস্কৃতকে সাধারণতঃ ভিত্তি-স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবেই; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মানবের চিন্তা-জগৎ গতিশীল; ইহার ক্রম বিবর্ত্তনে নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন প্রণালী জন্মলাভ করে। সেই সকল ভাব ও প্রণালী সংস্কৃত সাহিত্যে না থাকিলেও কিছু অগৌরবের কথা নহে। এ সকল স্থলে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিবার রীতি অন্য সমস্ত ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক সাহিত্য নানা ভাষা হইতে সংগৃহীত শব্দে পরিপূর্ণ।

দার্শনিক সাহিত্যের উন্নতির আর একটী উপায় পরস্পরের ভাব বিনিময়ের ব্যবস্থা। যাঁহার দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহারা যদি সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের মনোভাব ও অনুশীলন প্রণালী জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন; তাহা হইলে যে শুধু তাহার দ্বারা অনেক দার্শনিক তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন ও মীমাংসা হইতে পারে তাহা নহে; সেই সঙ্গে আমাদের দেশে দার্শনিক সাহিত্যেরও উন্নতি হইতে পারে। কতকটা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কয়েক বৎসর হইল (Calcutta Philosophical Society) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মৌলিক অনুসন্ধান ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বারা দার্শনিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা, ভারতীয় দর্শনের অনুশীলন এবং অভিনব বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর দ্বারা ভারতীয় দর্শন-সমূহের আলোচনা

দার্শনিক সত্যের আলোকে আমাদের ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের উপায় স্থিরীকরণ প্রভৃতি ঐ সমিতির উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। আমার মনে হয় এইরূপ সমিতি দর্শন-সাহিত্যের উন্নতির পক্ষেও বিশেষ সহায়তা করিতে পারে।

কিন্তু এস্থলে একটি কথা এই, অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে দর্শন সম্বন্ধে আমাদের ভাবপ্রকাশের পক্ষে ইংরেজী ভাষাই অধিকতর উপযোগী। ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গালার সাহায্য লইতে যাইব কেন? ইংরেজি ভাষা যে আমাদের ভাব প্রকাশে বেশী সহায়তা করে, তাহাতে অগৌরবের কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়াই বর্ত্তমান কালে আমাদের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর এক বিপুল সাহিত্যের দ্বার আমাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহা কদাচ উপেক্ষার বস্তু নহে। পরন্তু আমরা যে এই অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়াছি, ইহা গৌরবের বিষয়। ইয়ুরোপে মধ্যযুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা লাটিন ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে সুবিধা বোধ করিতেন, লাটিন ভাষায়ই পুস্তক লিখিতেন। পরে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির মাতৃভাষা (Vernacular) উন্নতি লাভ করিল, তখন লাটিনের আর প্রয়োজনীয়তা রহিল না। বাঙ্গালা ভাষা যখন পরিপুষ্ট হইবে, ইহার শব্দ-দৈন্য যখন ঘুচিবে, বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক যখন অন্য ভাষায় অনূদিত হইবে, তখন হয়ত আমাদেরও আর ইংরেজির সহায়তা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ইংরেজি ভাষায় আমাদের চিন্তার ফল সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সংকুচিত হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ জগতের বিচারালয়ের সমক্ষে সেগুলিকে উপস্থিত করা, ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এইরূপ চিন্তার প্রচার করা আপাততঃ কেবল ইংরেজি ভাষার দ্বারাই হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ প্রণালী বঙ্গ-ভাষার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি যে পরোক্ষভাবে ইহার দ্বারাও বঙ্গসাহিত্য লাভবান হইবে। দেশে দার্শনিক চিন্তার প্রসার হইলেই বাঙ্গালা দার্শনিক সাহিত্য তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে। ইংরেজি ভাষার সাহায্যেই হউক, বা অন্য ভাষার সাহায্যেই হউক, যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন, তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে তাঁহাদের চিন্তা ও গবেষণার ফল জানিবার জন্য তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণ ব্যগ্র, তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।

এই স্থলে অনুবাদের উপকারিতা সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কোনও জাতির দার্শনিক সাহিত্য পরিপুষ্ট করিতে হইলে কেবল মৌলিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। অনুবাদের মূল্যও এস্থলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপেই ভাবের আদান প্রদান হইয়া থাকে। এইরূপ বিনিময়ের দ্বারা জগতের সমস্ত সাহিত্য সর্ব্বকালে উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে।

প্রাচীনকালে দার্শনিক বিদ্যা ভারতে জন্মলাভ করিয়া প্রাচ্য দেশ-সমূহে বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপ পশ্চিমে দার্শনিক বিদ্যা গ্রীসে জন্মলাভ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এবং এক সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে, ভারত এবং গ্রীসের মধ্যে, পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যের ন্যায় চিন্তারও বাণিজ্য যে প্রচলিত ছিল, তাহা ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। পাইথাগোরাসের (Pythagoras) জন্মান্তরবাদ ও সাধন-প্রণালী যে ভারতীয় দর্শন ও সাধনের নিকট ঋণী, সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পরস্পর আদান প্রদানে ভাবসম্পদ্ অনেক বাড়িয়া যায়, আমাদিগের দার্শনিক সাহিত্যের পক্ষে এরূপ ঋণগ্রহণ যে নিতান্ত স্বাভাবিক ও শুভাবহ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাব প্রবাহ কোনও সময়ে কোনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। মানবের চিন্তা সর্ব্বদা গতিশীল। গতিশূন্যতা বা জড়ত্বই চিন্তার অভাব সূচনা করে। বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির চিন্তাপ্রবাহ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া তাহারই ঘাত প্রতিঘাতে নূতন নূতন ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি করে। সুতরাং কোনও একটি ভাবের ধারা বা আদর্শ চিরকালের জন্য কোনও জাতির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া থাকিতে পারে না। প্রাচীনকালে ভারতীয় দর্শন সমূহের একটি সাধারণ গতি বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। ব্যক্তিগত আত্মার মুক্তি সাধনই সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই হউক, নির্ব্বাণই হউক, আর ব্রহ্মস্বরূপত্ব-প্রাপ্তিই হউক, যে কোন উপায়ে মানবাত্মার মোক্ষ-সাধনই পরমপুরুষার্থ। ইহাই একমাত্র কাম্য; ইহাই একমাত্র শ্রেয়ঃ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, আত্মাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে, মায়ার বিনাশ-সাধন করিতে হইবে, উপাধিশূন্য হইতে হইবে, অনাদি বাসনা-সন্তান ধ্বংস করিতে হইবে। কেন?

মুক্তির জন্য ; সংসার-বন্ধন-মোচনের জন্য ; আত্মার কল্যাণের জন্য ; নিঃশ্রেয়স-লাভের (Summum bonum) জন্য। সাধারণতঃ ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূল সূত্র।

গ্রীকদর্শনের গতি ছিল স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগতভাবে ও সমগ্রভাবে জীবনের সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলবিধান করাই গ্রীক দর্শনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতেই গ্রীকদিগের জাতীয় প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছিল। দর্শনেও তাহাদের এই সৌন্দর্য্য-স্পৃহা আত্মবিকাশ করিতে ছাড়ে নাই। মানব-জীবনকে সর্ব্বতোভাবে একটি সুস্থ সামঞ্জস্যের ভাবে গঠন করিয়া লইতে তাহারা তাহাদের চিন্তা-প্রণালী নিয়োজিত করিয়াছিল। প্রথম হইতেই গ্রীকদিগের ব্যক্তিগত জীবন সমাজের সহিত অতি নিবিড় ভাবে জড়িত দেখিতে পাই। আদিম অধিবাসীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সতর্কতা অবলম্বন করিতে গিয়াই হউক, অথবা পার্শ্ববর্ত্তী নগর বা সমাজ হইতে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্যই হউক, গ্রীকেরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইয়াছিল। এই জন্য ভারতীয় দর্শনে যেরূপ মানবাত্মার কল্যাণ অথবা ব্যক্তিগত মোক্ষের সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীক দর্শনে সেইরূপ প্রধানতঃ সমাজ বা রাষ্ট্রের হিতের জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতীয় ও গ্রীক উভয় দর্শনের মূল কথা আত্মা ও জগৎকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা। ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই একই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় দর্শন আত্মার ও বিশ্বের জ্ঞানকে মোক্ষের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—দুঃখ নিবৃত্তি পুনরাবর্ত্তন-রাহিত্য বা নির্ব্বাণের অভিমুখে নিয়োজিত করিয়াছিল। গ্রীক দর্শন আত্মা ও জগতের জ্ঞানকে মানব-জীবনের সুখ, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণ-বিধানের জন্য এবং রাষ্ট্রের হিতের ও উন্নতির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিল। ভারতীয় চিন্তার গতি হইল ব্যক্তিগত আত্মার হিতের দিকে, শ্রেয়ের দিকে, যোগের দিকে, সন্ন্যাসের দিকে। গ্রীসীয় চিন্তার গতি হইল—রাষ্ট্রের মঙ্গলের দিকে, সৌন্দর্য্যের দিকে সামঞ্জস্যের দিকে, কর্ম্মের দিকে।

বর্ত্তমান সময়েও পাশ্চাত্য জগতে গ্রীক ভাবের প্রভাব দেখা যায় এবং

প্রভাবে পাশ্চাত্যজগৎ বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম ও গূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া মানব জীবনের সুখ ও আধিপত্যের উপাদান সংগ্রহ করিতেছে। এবং রাষ্ট্রে সুশাসন স্থাপন করিয়া সকলের মঙ্গল সাধন করিতেছে। আর আমরা এখনও মুক্তি পথ কোন দিকে তাহার বার্ত্তা জানিবার জন্য সেই প্রাচীনকালের তপোবনের স্বপ্ন লইয়া বসিয়া আছি।

ভারতীয় এবং বিদেশীয় মনীষিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই দুইটি আদর্শকেই যে কতকটা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি না। মহাভারত এবং মনুসংহিতায় রাষ্ট্র-হিতের একটি সুন্দর কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটোর (Plato) দর্শনে এই উভয়বিধ আদর্শের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একদিকে যেমন নিত্য চিরন্তন সত্যসুন্দরমঙ্গল স্বরূপকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, তেমনই অপর দিকে রাষ্ট্র বা সমাজের কল্যাণ ও সামঞ্জস্য-কল্পনাও তিনি অতি সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্লেটো যে শুধু দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন মহা-ঋষি ছিলেন। ঋষি শুধু সত্যের প্রচারক নহেন, তিনি দ্রষ্টা।

এরিষ্টটল্ (Aristotle) তাঁহার গুরু প্লেটোর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা পাইয়াছিলেন এবং সে অসাধারণ প্রতিভার আলোক আরও কত উজ্জ্বলভাবে নানা বিষয়ের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুর সেই ঋষিভাবটুকু তেমন প্রাপ্ত হয়েন নাই। প্লেটোর যথার্থ ঋষিভাবটি তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। অনেক দিন পরে যদিও প্লেটোর প্রভাব সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সেই ঋষিত্ব আর পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় নাই।

ঋষি সত্যকে, মঙ্গলকে, সুন্দরকে দর্শন করেন, প্রত্যক্ষ করেন, জীবনের অন্তরতম অন্তস্তলে অনুভব করেন। এই যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করা, ইহার নামই দর্শন। সুতরাং যথার্থ দার্শনিক হইতে হইলে ঋষি হওয়া চাই। শুধু সত্যের বিশ্লেষণে প্রকৃত দার্শনিক হওয়া যায় না।

ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে এই ঋষিভাব বহুলপরিমাণে না থাকিলেও ইঁহাদের নিকট আমাদের শিখিবার ও জানিবার বিষয় অনেক আছে। এ

কথাটী ভুলিলে চলিবে না। সমস্ত বাস্তব জগৎকে কাল্পনিক মনে করিয়া ইহ জীবনের সমস্ত বস্তু হেয় বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক জগতের নিত্য নব আবিষ্কারে আর উদাসীন থাকা সম্ভব নহে। জড়জগতের এই সকল সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হইলে সত্যের এক অংশের প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে একটি নিগূঢ় সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা পাশ্চাত্য দর্শনের একটি বিশেষ লক্ষ্য। এ বিষয়ে গ্রীক দর্শন যে সুমহান্ আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছে, ইহা কোনও ক্রমে উপেক্ষার সামগ্রী নহে। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে ভারতীয় ও গ্রীক চিন্তার দুইটি ধারাকে একত্র করিতে পারিলে জগতের দার্শনিক জ্ঞান-ভাণ্ডার অভাবনীয়রূপে উন্নতি লাভ করিবে।

একদিকে পাশ্চাত্য দর্শনের নিকট আমাদের যেমন শিখিবার বিষয় রহিয়াছে, তেমনি আমাদের দর্শনের নিকটেও পাশ্চাত্য জগৎ অনেক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিকতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্ব্বকালেই সর্ব্ব জাতির বিস্ময় উৎপাদন করিবে। বর্ত্তমানকালে ইয়ুরোপীয় চিন্তার উপর এই ভারতীয় ভাবের প্রভাব ক্রমশঃ লক্ষিত হইতেছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া জড় জগতের ও বাস্তবের উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিয়া পাশ্চাত্য জগৎ আত্মার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা-গুলিকে নিরুদ্ধ করিতে বসিয়াছিল; বাহ্য-বস্তু-জনিত সুখ ও ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধির সন্ধানে তাহারা ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ ও বৈরাগ্যের মহত্ত্ব ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল। আবার এ সকলের দিকে পাশ্চাত্য চিন্তার স্রোত ধীরে ধীরে ফিরিতেছে। এই জন্যই আমার মনে হয় যে, ভবিষ্যতের দার্শনিক ইতিহাস গ্রীক ও ভারতীয় আদর্শের সংমিশ্রণেই ও সামঞ্জস্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে।

ইংরেজের রাজ্য বিস্তার ফলে ভারতে এই উভয় আদর্শের সম্মিলন ঘটিয়াছে। এ সুযোগ আমরা যেন পরিত্যাগ না করি। গ্রীক আদর্শকে অঙ্গীভূত করিয়া ভারতীয় দর্শন যে আদর্শের সৃষ্টি করিবে, তাহা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হইবে। এই সম্মিলন ও সামঞ্জস্য পাশ্চাত্য জগতেও এখন আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়াছে। যদি আমরা এই দুইটি আদর্শকে মিলিত করিয়া জগতের সমক্ষে স্থাপিত করিতে পারি, তাহা হইলে সে গৌরব

হইতে আমরা বঞ্চিত হইব কেন? এইরূপ ভাবে যদি আমাদের দার্শনিক সাহিত্য উন্নতি লাভ করে, তবে তাহার প্রভাব সমস্ত সভ্য জগৎ অনুভব করিবে। এক সময়ে যদি ভারতের চিন্তার দ্বারা চীন, পারস্য, মিশর, গ্রীস প্রভাবিত হইয়া থাকে, তবে এ আশা আকাশ-কুসুম মাত্র নহে যে আবার এমন দিন আসিবে যখন ভারতের দার্শনিক চিন্তা জগতের চিন্তারাজ্যে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর বিপ্লব উপস্থিত করিবে।

গোত্র।

(ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত)

মিতাক্ষরাধৃত আশ্বলায়ণ সূত্রে দেখিতে পাই "যজমানস্য আর্ষেয়ান্ প্রবৃণীত" যজ্ঞাদি কার্য্যে যজমানের গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ করিবে। আরও দেখিতে পাই, "পৌরহিত্যান্ রাজন্যবিশাং প্রবৃণীত।" ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের যজ্ঞাদি কার্য্যে তাহাদের পুরোহিতের গোত্র এবং প্রবরের উল্লেখ করিবে। হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলজনক বৈদিক কার্য্যাদিতে গোত্র ও প্রবরের উল্লেখের উদ্দেশ্য কি, তাহা আলোচনা করার পূর্ব্বে গোত্র ও প্রবর বলিতে কি বুঝায় বা প্রাচীনকালে কি বুঝাইত, তাহা জানা আবশ্যক।

আবার ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতিদিগের বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে, পুরোহিত-গোত্রের উল্লেখের বিধিতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদের নিজস্ব কোনও গোত্র নাই, চন্দ্র যেমন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত, তাহারাও তেমনি পুরোহিতের গোত্রে গোত্রান্বিত। এখন একটী প্রশ্ন হইতে পারে। পুরোহিতের পরিবর্ত্তন অসম্ভব ব্যাপার নহে। পুরোহিতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতির গোত্র প্রবরাদিরও পরিবর্ত্তন সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিতে হইলেও, ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতি কিরূপে পুরোহিতের গোত্রে গোত্রান্বিত হইলেন, তাহা জানা দরকার।

এখন, গোত্র শব্দের অর্থ কি দেখা যাউক। অভিধানকার ভরত বলেন "গবতে শব্দয়তি পূর্ব্ব পুরুষান্ যৎ ইতি গোত্রম্।" যদ্দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের নাম সূচিত হয়, তাহাকেই গোত্র বলে। পূর্ব্বপুরুষ সকলেরই আছে; পূর্ব্বপুরুষ-সূচক একটা শব্দ সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং ভরতের মতে যার পূর্ব্বপুরুষ আছে, তারই গোত্র থাকিতে পারে, সকলেরই নিজস্ব গোত্র থাকিতে পারে। কিন্তু আশ্বলায়ণ সূত্রের "পৌরহিত্যান্ রাজন্যবিশাং" দ্বারা বুঝা যায়, ব্রাহ্মণেতর জাতির নিজস্ব কোনও গোত্র নাই। এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি? স্মৃতি ইহার উত্তর দিয়াছেন। স্মৃতি বলেন, পূর্ব্বপুরুষকেই গোত্র বলা হয় বটে, কিন্তু সমস্ত পূর্ব্বপুরুষকেই গোত্র বলা হয় না। "বংশপরম্পরা

প্রসিদ্ধমাদিপুরুষ ব্রাহ্মণরূপং গোত্রম্।” বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ আদি-পুরুষকেই গোত্র বলা হয়, অন্য কোনওরূপ আদিপুরুষকে নহে। ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতির আদি পুরুষ কেহ না কেহ ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, এজন্য তাঁহারা গোত্র হইতে পারেন না, কাজেই ব্রাহ্মণেতর জাতির নিজস্ব গোত্র থাকিতে পারে না। আবার যে সে ব্রাহ্মণও গোত্র প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না, ঋষিরাই গোত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন।

এখন দেখা যাউক, ভরত বা স্মৃতিকারের উক্তির মূল কোথায়? গোত্র = গো + ত্রৈ + ড; গো পূর্ব্বক ত্রৈ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয় করিয়া গোত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গো-কে ত্রাণ করে যাহা, তাহাই গোত্র, ইহা হইল গোত্রশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। Vedic Indiar গ্রন্থকার বলেন, এস্থলে “গো” অর্থ গোরু; এবং গোত্র অর্থ hedge অর্থাৎ বেড়া। হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হইতে গোরুগুলিকে রক্ষা করিত বলিয়া বেড়ার একটী নাম ছিল গোত্র। আমাদের পুরাণও এই উক্তির সমর্থন করে। পুরাণে লিখিত আছে, প্রাচীনতম ঋষিগণ পুত্র পৌত্র ও শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া বহুসংখ্যক পরিবার একত্রে আশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহাদের আশ্রমের গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগুলিকে হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আশ্রমের চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত প্রাচীর বা বেড়া রচনা করিয়া দেওয়া হইত। এই বেড়াকেই গোত্র বলা হইত।

গোত্র শব্দের আদি অর্থ যে বেড়া বা প্রাচীর তাহা একপ্রকার বুঝা গেল। কিন্তু কিরূপে ইহার অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্রাহ্মণরূপ পূর্ব্বপুরুষে পরিণত হইল, তাহা দেখা যাউক।

পৌরাণিক উক্তির উল্লেখে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীনতম ঋষিগণ পুত্র পৌত্র শিষ্যাদিকে সঙ্গে লইয়া বহুসংখ্যক পরিবার একত্রে আশ্রমে বাস করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান থাকিতেন, তিনিই এই আশ্রমের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতেন; তিনিই গুরু, তিনিই পুরোহিত, তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারই নামে এই আশ্রম পরিচিত হইত, তাঁহারই নামে আশ্রমের চারি-দিগের বেড়া বা গোত্রও পরিচিত হইত। আজ কাল যেমন দূর হইতে কাহারও বাড়ীর প্রাচীর দেখিলেই আমরা বলিয়া থাকি যে, ঐটী অমুকের বাড়ীর প্রাচীর, প্রাচীনকালেও আশ্রমের চারিদিকের গোত্র বা প্রাচীর দেখি-য়াই লোকে আশ্রমের নাম বলিতে পারিত। আবার কেবল প্রাচীর দেখিয়াই আমরা বলি যে, অমুকের বাড়ী দেখা যায়, প্রাচীনকালেও কেবল গোত্র বা প্রাচীর দেখিয়াই লোকে সম্ভবতঃ বলিত যে, অমুকের আশ্রম দেখা যায়। এইরূপে আশ্রমের চতুর্দ্দিকের বেড়াদ্বারা ক্রমশঃ আশ্রমই সূচিত হইতে লাগিল। অমুক অমুকের বাড়ীর লোক, একথা বলিলে আজকাল আমরা যাহা বুঝি, অমুক অমুকের গোত্রের লোক, একথা বলিলে প্রাচীন কালের লোকও

তাহাই বুঝিত। এইরূপে কশ্যপের আশ্রমের চারিদিকে যে বেড়া ছিল, তাহাকে কশ্যপের গোত্র এবং কশ্যপের আশ্রমের লোকদিগকে কশ্যপের গোত্রের লোক বলিয়াই লোকে পরিচয় দিত। গোত্রের নামের সহিত আশ্রমস্থ প্রধান ব্যক্তির নামের ঘনিষ্ঠতা থাকাতে এবং লোকের পরিচয়ের সময়ে উভয়েরই সমভাবে প্রয়োগ হওয়াতে কিছু কাল পরে গোত্র শব্দ আর বেড়াকে না বুঝাইয়া যে, কেবলমাত্র গোত্র মধ্যবর্ত্তী প্রধান ব্যক্তিকেই বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইহা অনুমান করাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

আমরা এখনও দেখিতে পাই, যাঁহার নামে কোনও বাড়ী প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাঁহার পরলোক গমনের পরেও ঐ বাড়ী তাঁহারই নামে পরিচিত হইয়া থাকে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আবাসস্থানটী আজও বিদ্যাসাগরের বাড়ী বলিয়া পরিচিত। কশ্যপ ঋষির অন্তর্ধানের পরেও তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ গোত্র বা বেড়া বা আশ্রম যে তাঁহারই নামে পরিচিত হইতেছিল, ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। সুতরাং সেই আশ্রমের লোকগণ এবং তাঁহাদের বংশধরগণ কাশ্যপ গোত্রের লোক বলিয়াই যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়। কারণ পূর্ব্বপুরুষের নামে লোকের পরিচয় দেওয়াই স্বাভাবিক।

গোত্র শব্দে কিরূপে ব্রাহ্মণরূপ পূর্ব্বপুরুষকে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা আমরা এতক্ষণে একরকম বুঝিতে পারিলাম। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে না; সুতরাং ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও যে নিজস্ব কোনও গোত্র থাকিতে পারে না, তাহাও বুঝা গেল। এজন্যই আশ্বলায়ণ সূত্র বলিয়াছেন—"পৌরহিত্যান্ রাজন্যবিশাং প্রবৃণীত।" ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পুরোহিতের গোত্রের উল্লেখ করিবে। কিন্তু কোন্ পুরোহিতের গোত্রের উল্লেখ করা বিধেয়? যিনি যে যজ্ঞে পুরোহিতের কাজ করিবেন, সেই যজ্ঞে যদি তাঁহারই গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতির যে কোনও নির্দ্দিষ্ট গোত্র থাকিতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়, কারণ তাহা হইলে পুরোহিতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোত্রেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আর্য্যঋষিগণ গোত্রকে বোধ হয়, পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তনের যোগ্য জিনিষ বলিয়া মনে করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণের পক্ষে বংশের প্রসিদ্ধ আদিপুরুষই গোত্র। এই আদিপুরুষ যেমন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, ব্রাহ্মণের গোত্রও তেমন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের গোত্রের অনুকরণে অন্যান্য জাতির যে যে গোত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও অপরিবর্ত্তনীয় হওয়াই সঙ্গত। এই অনুমান যদি অসঙ্গত না হয়, তবে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতীয় কোনও লোকের পূর্ব্বপুরুষ যে গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিকে পুরোহিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, আশ্বলায়ণের "পৌরহিত্যান্" শব্দদ্বারা সেই পুরোহিতের গোত্রই সূচিত হইতেছে বলিয়া

অনুমিত হয়। সুতরাং পুরোহিত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও গোত্র পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বপুরুষের আচরিত রীতিনীতির অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বিধি আছে, সেই সমুদয়ও এইরূপ সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছে।

উপরে যেরূপ বলা হইল, তাহাতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ গোত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন না। গুণকর্ম্মপ্রভাবে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতির কেহ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিলে, তিনিও যে গোত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বিশ্বামিত্র ঋষিই তাহার দৃষ্টান্ত। বিশ্বামিত্র গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত লোক ব্যতীত আরও যে গোত্র প্রবর্ত্তক হইতে পারেন, ভবিষ্যপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপাস্য দেবতার নামেও গোত্রের নাম হইতে পারে। ঋজিশ্বা নামে এক ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি মিহির গোত্রীয় ছিলেন।

গোত্রং মিহিরমিত্যাহুর্ব্রতং তু ব্রাহ্মমুত্তমং।
ঋজিশ্বা নাম ধর্ম্মাত্মা ঋষিরাসীৎপুরানঘ॥ ১৩৯।৩৪॥

ভবিষ্যপুরাণে লেখা আছে, শাকদ্বীপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এক সময়ে শাকদ্বীপের রাজা প্রৈয়ব্রত সূর্য্যপূজা করিবার বাসনা করিয়া সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেই মন্দিরে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অভাবে পূজার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। তখন তিনি সূর্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান্ সূর্য্যদেব তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সূর্য্যদেবের শরীর হইতে আটজন ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই ব্রাহ্মণেরাই প্রৈয়ব্রতের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে সূর্য্যপূজা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেবের আদেশানুসারে বংশ পরম্পরাক্রমে ইহাঁরা সূর্য্যদেবেরই উপাসনা করিতেন। মহাপরাক্রান্ত ঋজিশ্বা ঋষি এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই আটজন ব্রাহ্মণের ন্যায় ঋজিশ্বার আদিপুরুষও সূর্য্যই ছিলেন। সূর্য্যের একটী নাম মিহির। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আদিপুরুষের নামানুসারেই গোত্রের নাম হইয়া থাকে। ঋষি ঋজিশ্বার আদিপুরুষ যখন মিহির বা সূর্য্য, তখন তাঁহার গোত্রের নামও মিহিরই হইবে। এই স্থলে দেখা গেল, ঋজিশ্বা ঋষির আদিপুরুষ দেবতা হইলেও তাঁহারই নামে ঋজিশ্বার গোত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যে যে স্থলে কাহারও নামের উল্লেখ করা আবশ্যক, ঠিক সেই সেই স্থলেই তাহার গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে পরিচিত করিয়া দেওয়ার নিমিত্তই তাহার গোত্রোল্লেখের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। হরিহর শর্ম্মার নামে পিণ্ড দিতে

হইবে, কিন্তু জগতে ত কত হরিহর শর্ম্মাই থাকিতে পারে! কত হরিহর শর্ম্মার আত্মাই হয়ত পিণ্ডের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে! ইহাদের মধ্যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিণ্ড অর্পিত হইতেছে? তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্যই বলা হয় যে, অমুক গোত্রীয় হরিহর শর্ম্মা। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই গোত্রেও ত অনেক হরিহর শর্ম্মা থাকিতে পারেন? সুতরাং বিশেষরূপে পরিচিত করিবার জন্য তাহার প্রবর, পিতা, পিতামহ প্রভৃতির নাম এবং তাঁহার সহিত পিণ্ডদাতার সম্পর্কাদির উল্লেখ করা হয়। এই অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তবে গোত্র আমাদের চিঠি পত্রের জেলা পোষ্টাফিস বা গ্রাম বাড়ীর ন্যায় একটা কিছু। কিন্তু এই অনুমান কতদূর সমীচীন তাহা বলিতে পারি না।

একগোত্রে বিবাহ।

বর ও কন্যার সমান গোত্র বা সমান প্রবর হইলে বিবাহজাত সন্তানাদি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাই স্মৃতির ব্যবস্থা। পৃথিবীর অপর কোনও জাতির মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। কিন্তু হিন্দুর মধ্যে দ্বিজাতির মধ্যে আছে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি? আমাদের মনে হয়, শোণিত সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শাস্ত্রকারগণ এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

বর ও কন্যা যদি একই বংশের হয়, তবে তাহাদের বিবাহে একটী প্রধান দোষ এই হয় যে, বিবাহজাত সন্তানগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে; বর ও কন্যা উভয়ে এক বংশজাত বলিয়া উভয়েরই বংশানুগত দোষ গুণ একইরূপ থাকে; সুতরাং তাহাদের যে সন্তানাদি জন্মিবে, তাহাদেরও ঐ দোষ গুণ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু বর ও কন্যা ভিন্ন বংশীয় হইলে, পরস্পরের সংমিশ্রণে পরস্পরের বংশানুগত দোষ সমূহের লাঘব হইতে পারে, এবং বিবাহোৎপন্ন সন্তানাদি উন্নততর প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারে। এজন্যই যাহাদের শরীরে একইরূপ রক্তের অস্তিত্ব সম্ভব, ভিন্ন গোত্র হইলেও তাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এজন্যই মাতুলকন্যা, পিসীকন্যা, প্রভৃতি ভিন্ন গোত্রীয় কন্যার পাণিগ্রহণও নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কয়েক পুরুষ অতীত হইয়া গেলে, একই বংশের বর ও কন্যার মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ যে

কয় পুরুষ অতীত হইয়া গেলে আর রক্তের সংস্রব থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না, সেই কয় পুরুষ অতীত হইয়া গেলেই শাস্ত্রকারগণ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা করি। ভৃগুবংশের অন্তর্গত জমদগ্নি, বিদ, পৌলস্ত্য, বৈজভৃৎ, উভয়জাত, কায়নি ও শাকটায়ণ এই সাতটী গোত্রের মধ্যে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ; এই সকল গোত্রের দুইটী প্রবর; যথা ঔর্ব্বেয় ও মারুত। আবার সেই ভৃগুবংশেরই অন্তর্গত আষ্টিষেণ, গার্দ্দভি, কার্দ্দমায়নি, আশ্বায়নি ও অরূপি এই পাঁচটী গোত্রের মধ্যেও পরস্পর নিষিদ্ধ; এই সকল গোত্রের পাঁচটী প্রবর; যথা, ভৃগু, চ্যবন, আপ্নুবান্, আষ্টিষেণ ও অরূপি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই প্রবরযুক্ত সাতটী গোত্রের কোন এক গোত্রের সহিত, শেষোক্ত পঞ্চ প্রবরযুক্ত পাঁচটী গোত্রের কোনও এক গোত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। নব্যস্মৃতি অনুসারেও এইরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ নাই। কারণ স্মৃতি বলেন, সগোত্রা-সমানপ্রবরা কন্যা অবিবাহ্যা। যে বর কন্যার গোত্র ও প্রবর এক, তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত সাতটী গোত্রের কোনটীর নামের সহিত, শেষোক্ত পাঁচটী গোত্রের কোনটীর নামের মিলও নাই; এবং প্রবরের মিলও নাই; প্রথমোক্ত গোত্রগুলি দ্বিপ্রবরযুক্ত, শেষোক্তগুলি পঞ্চপ্রবরযুক্ত। সুতরাং প্রথমোক্ত গোত্রগুলির সহিত শেষোক্ত গুলির বিবাহ হইতে পারে। এইরূপে জমদগ্নি গোত্রের সহিত অরূপি গোত্রের বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু জমদগ্নি ও অরূপি উভয়েই এক ভৃগুবংশ সম্ভূত, তথাপি তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। সম্ভবতঃ এই দুই গোত্রের মধ্যে শোনিতসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে মনে করিয়াই শাস্ত্রকারগণ এইরূপ বিবাহ অবিধেয় মনে করেন নাই। যে সমস্ত গোত্রের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ মনে করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহাদের সকলেরই একইরূপ প্রবর করিয়া সমান প্রবরে বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বিবাহের ব্যবস্থা প্রদানকালে শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বদাই রক্তের সংস্রবের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সমান গোত্র ও সমান প্রবরে বিবাহের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আমরা এইরূপ দৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছি। অন্যত্রও পাওয়া যায়। সপিণ্ড সমানোদক, পিতৃপক্ষে, মাতৃপক্ষে, পিতৃ মাতৃ বন্ধুপক্ষে যে কতগুলি সম্পর্কে বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, তাহাতেও রক্তের সংস্রবের দিকে শাস্ত্রকারদের তীক্ষ্ণ

সগোত্রে বিবাহ নিষেধ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, যে সময়ে এই সমস্ত শাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথা অনুসারে সমস্ত সগোত্রীয় লোকগণই একত্রে বাস করিত যাহারা একত্রে বাস করে, তাহাদের যৌনসংস্রব সম্বন্ধে একটা কঠোর প্রতিবন্ধক না থাকিলে, নৈতিক জীবনের অবনতির আশঙ্কা আছে ; এজন্যই শাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন—

অসগোত্রাচ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মনি মৈথুনে ॥

"যে কন্যা পিতার সগোত্রা নহে, বিবাহে ও মৈথুন কর্ম্মে তাদৃশী কন্যাই দ্বিজাতিদিগের প্রশস্ত।" আরও বলিয়া গিয়াছেন,—

সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেবহীয়তে ॥

যদি কেহ সমান গোত্রা এবং সমান প্রবরা বিবাহ করিয়া তাহাতে গমন এবং সন্তান উৎপাদন করে, তবে তথাবিধ সন্তান চণ্ডাল সদৃশ হয় এবং তাদৃশ বিবাহকর্ত্তা ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হয়।

জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, যাহারা একত্রে বাস করে, তাহারা যদি জানে যে, তাহাদের দুইজনের কখনও বিবাহ হইতে পারিবে না, তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ ইন্দ্রিয় সংস্রব ঘটিলে, উক্ত বিধানানুসারে তাহাদিগকে কঠোর সামাজিক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে তাহাদের মনে কোনওরূপ আসক্তি জন্মিয়া পরস্পরের নৈতিক জীবনের হেয়তা সাধন করিবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সাহেবের উক্তি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা রক্তের সংস্রবের কথাই আমাদের নিকটে অধিকতর সমীচীন মনে হয় ; এবং ইহা শারীর-বিজ্ঞানেরও অনুমোদিত।

যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি, এক ভৃগু বংশে জন্ম হইলেও, জমদগ্নি গোত্রের সহিত অরূপি গোত্রের বিবাহ হইতে পারে। জমদগ্নির পৌত্রীর সহিত অরূপির পুত্রের বিবাহ হইলে তাহা নিন্দনীয় হইবে না।

মনে করুন যেন বংশের আদি পুরুষ ভৃগু হইতে জমদগ্নি পঞ্চাশ পুরুষ অন্তর, এবং অরূপি যেন অন্য শাখায় সত্তর পুরুষ অন্তর। এখন, যদি জমদগ্নি

গোত্র হইত না; এবং ভৃগু ও জমদগ্নির মধ্যে যে সকল গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি জন্মিয়াছিলেন, যদি তাঁহাদের কাহারও নামেই নূতন গোত্র না হইত; সেইরূপ ভৃগু ও অরূপির মধ্যবর্ত্তী ঋষিদিগের নামেও যদি কোন নূতন গোত্র না হইত, তাহা হইলে ঐ সমস্ত ঋষিগণের, এবং জমদগ্নি ও অরূপির—ইহাদের সকলেরই তাহাদের প্রসিদ্ধ আদি পুরুষ ভৃগুর নামে ভৃগু গোত্র হইত। তাহা হইলে, ভৃগু, জমদগ্নি, অরূপি এবং ভৃগুবংশীয় অন্যান্য ঋষিগণের পরস্পরের এখন যে সম্বন্ধ, তখনও ঠিক সেই সম্বন্ধই থাকিত; তাহার কোনওরূপ ব্যতিক্রম হইত না। জমদগ্নি এখন যেমন ভৃগু হইতে ৫০ পুরুষ নীচে, তখনও ৫০ পুরুষ নীচেই থাকিতেন। অরূপি এখন যেমন ভৃগু হইতে সত্তর পুরুষ নীচে, তখনও সত্তর পুরুষ নীচেই থাকিতেন। তাঁহারা এখন যাহা আছেন, ঠিক তাহাই থাকিতেন। এমতাবস্থায় যদি জমদগ্নির পৌত্রীর সহিত অরূপির পুত্রের বিবাহ হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, ন্যায়তঃ কোন দোষই হইত না। যে উদ্দেশ্যে সমান গোত্রা ও সমান প্রবরা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ, এই বিবাহে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকিত। অথচ বংশের আদি পুরুষের নামে বর ও কন্যা উভয়েরই এক ভৃগু গোত্র হইত। এমতাবস্থায় স্বগোত্রে বিবাহ দূষণীয় হইবে কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়।

তাপিতের উচ্ছ্বাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, সমাজে তাপিতের উচ্ছ্বাসের সমালোচনা ও বিনামূল্যে বিতরণের কথা প্রকাশিত হইবার ফলে প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি ঐ পুস্তক খানি পাইবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ব্যক্তিই ডাক টিকিট পাঠান নাই তিনি নিজ হইতে ডাক ব্যয় করিয়া বহুসংখ্যক পুস্তক তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, এখনও বহু ব্যক্তি ঐরূপ পত্র লিখিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে এক্ষণে যাঁহাদিগের উক্ত পুস্তক আবশ্যক হইবে তাঁহারা যেন পত্র মধ্যে অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট পাঠাইয়া দেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সাল।

৫ম বর্ষ—২য় সংখ্যা।

সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ।

বর্ত্তমান সংখ্যা হইতেই

বেদান্ত ভাষ্য,

বৌদ্ধধর্ম্ম

এবং চন্দ্রশেখর বাবুর

"কর্ম্ম"

প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

সমাজ কার্য্যালয়।

৭১নং শাঁখারিটোলা লেন,

কলিকাতা।
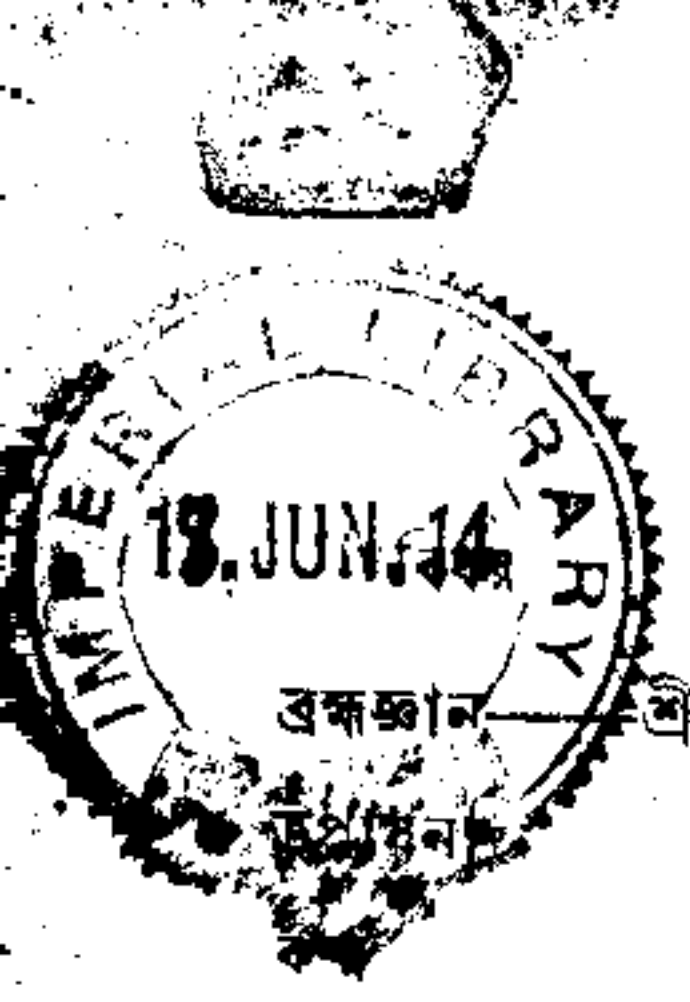
সূচী।

		পৃষ্ঠা
ব্রহ্মজ্ঞান	শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৩
[illegible]	„ রামসহায় কাব্যতীর্থ	৩৫
[illegible]	„ চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার	৩৯
গ্রন্থ পরিচয়	... ...	৪৬
বৌদ্ধধর্ম্ম	„ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	১৪১-১৪৮
বেদান্ত ভাষ্য	ঐ	৩১১-৩১৮

বিজ্ঞাপন।

সুপ্রসিদ্ধ ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় কর্ম্মশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ পুরুষ, তাহা বিদ্বজ্জনসমাজের অবিদিত নাই। তিনি আজ দুই বৎসর কাল যাবত থিয়সফিক্যাল সোসাইটী ও কলিকাতার অন্যান্য স্থানসমূহে কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমুদয় চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়া আসিতেছেন ও এখনও করিতেছেন, তাহাই প্রবন্ধাকারে সমাজের বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। কর্ম্মের রহস্য, পরলোক তত্ত্ব, কোন্ কর্ম্মের কোন লোকে কি প্রকার গতি, তাহার ভোগ, ভোগকাল এবং ভোগান্তে পুনরায় দেহধারণ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি জটিল রহস্য যাহা সাধারণ মানব মনে স্বতঃই উদয় হয়, কিন্তু সহজে কোন সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না এবং তজ্জন্য নানারূপ সন্দেহসঙ্কুল চিত্তে মনুষ্য নিজ কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে সক্ষম হয় না, কর্ম্মবীর চন্দ্রশেখর বাবু পৃথিবীর সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বহু আয়াসে তত্তৎ দেশের ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া পরীক্ষান্তে যে সার সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই বিশদরূপে সকলের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ মোক্ষ পর্য্যন্ত অতি সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। ভরসা করি, সমাজের পাঠকবৃন্দ তাঁহার এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশেষ তৃপ্তি এবং অসীম উপকার লাভ করিবেন।
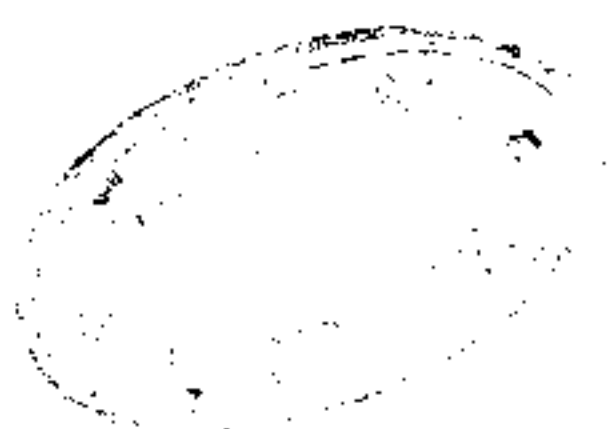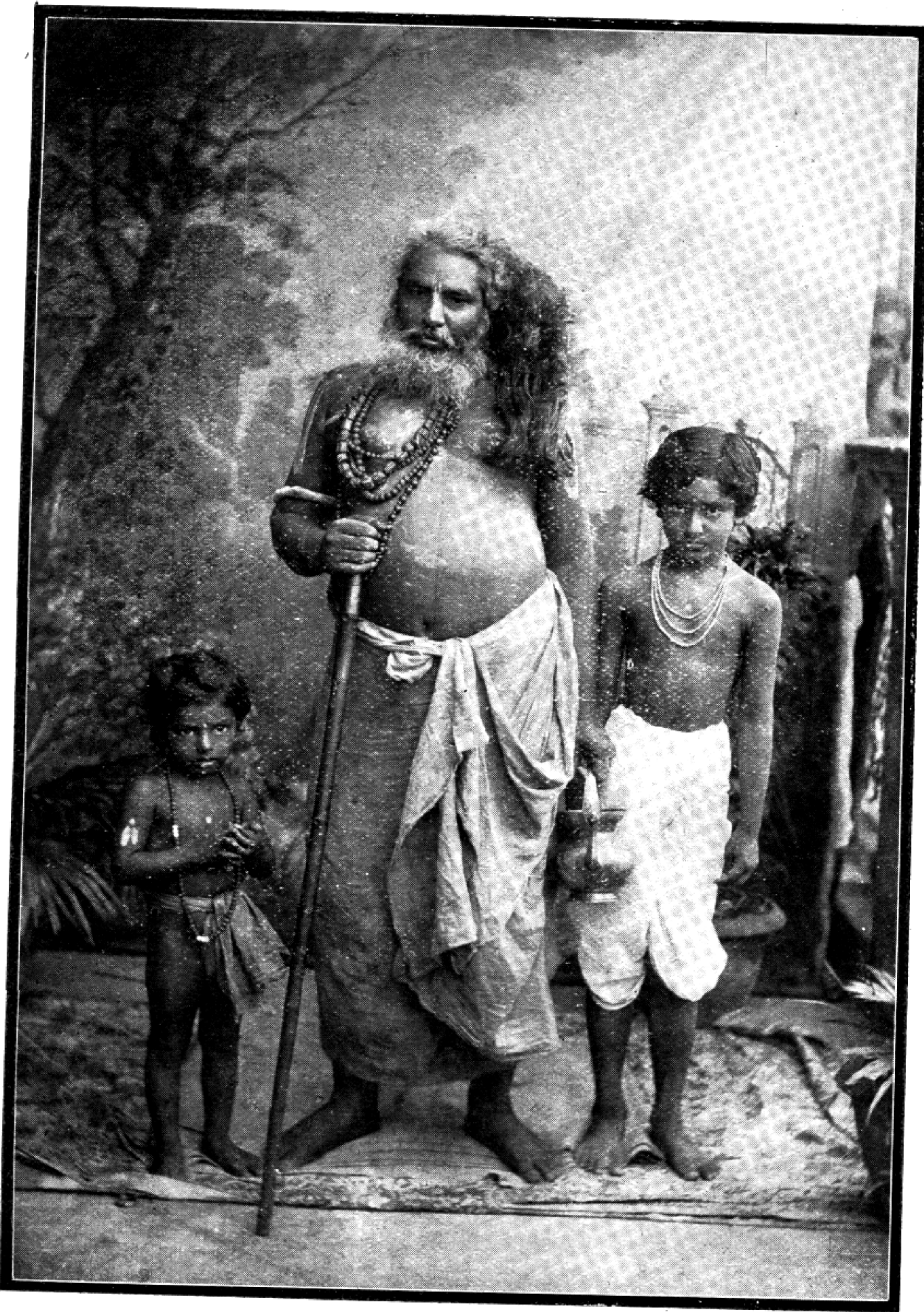
মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

দৌহিত্র। বালক দেবকুমার।

সমাজ

"উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সাল।	Vol. V. NO. 2.

ব্রহ্মজ্ঞান।

—•—

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১২৫ সূক্ত)

(১)

অংভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্দেবী যাঁহার নাম
"আমি ব্রহ্ম" করেন প্রচার।
সে জ্ঞানে বলেন সতী, যাহে গণিছেন রাধা
"আমি কৃষ্ণ"—কৃষ্ণ প্রাণাধার॥

(২)

বসুগণ রুদ্র সঙ্গে, আমি করি বিচরণ
আর ফিরি বিশ্বদেব সনে।
আদিত্য-নিকর, মিত্র, অনল বরুণ ইন্দ্র
অশ্বিনীযুগে রেখেছি ধারণে॥

(৩)

নিপীড়িত সোমরস, ত্বষ্টৃ, পূষা আমি সব
ভগদেবও করি ধারণ।
হবিদাতা যজমান, সোমরস করে বলে
ধরি আমি তারি তরে ধন॥

(৪)

জগত ঈশ্বরী আমি, ভুক্তি আমি যত ধন
সাক্ষাৎ আমিই ব্রহ্ম জ্ঞান।
যজ্ঞার্হ দেবতা মাঝে, মুখ্যা আমি এই বিশ্বে
বহুভাবে মোর অবস্থান॥

(৫)

প্রাণিগণ মাঝে আমি, প্রবিষ্ট হইয়া থাকি
দেবগণ মোরে নানা স্থানে—
সন্নিবেশ করে সদা, অস্তিত্ব পাইতে মম
স্থির ধীর মহাযোগ ধ্যানে॥

(৬)

ভোজন করেন যিনি, আর করেন দর্শন
শ্বাস প্রশ্বাস বাক্য শ্রবণ।
আমারি সাহায্যে তিনি, সদাই শকতি পান
(আমিই) অন্তর্য্যামী হৃদে জীবগণ॥

(৭)

যে ব্রহ্মের নিত্য সেবা, সদা করে দেব নরে,
এই মম সেই ব্রহ্ম কথা।
আমি করিলে বাসনা, মুহূর্ত্তে করিতে পারি,
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও সুমেধা॥

(৮)

ব্রহ্মদ্বেষী শত্রুচয় আমিই বিনাশ করি,
রুদ্রের ধনু করি বিস্তৃত।
যুদ্ধ করি জীব তরে, আমি দ্যুলোক ভূলোকে
অন্তর্য্যামী রূপেতে ব্যাপৃত॥

(৯)

বিরাটের মূর্দ্ধাসম, পিতৃরূপ ও আকাশ
হর্ষে আমি করেছি প্রসব।
কারণ সমুদ্র মাঝে ধীবৃত্তি চৈতন্য শক্তি
যোনি মোর বলিতেছে সব॥

(১০)

এরূপে বিশ্ব ভুবন　　প্রবেশ করিয়া আমি
নানা ভাবে করি অবস্থান।
মায়াত্মক দেহে মম,　　স্বর্গলোকে স্পর্শ করি,
স্বর্গে মর্ত্তে সবে মোর স্থান॥

(১১)

সৃজন লীলার কালে,　　নিখিল ভুবন তরে
বায়ু সম হই প্রবাহিত।
দ্যুলোক ভূলোক উহা,　　করিতেছে অতিক্রম
মহিমা মম অধিক এত।

(১২)

সদা মোহ ঘোরে মন,　　অচেতন রহিবে কি
জাগ, হের, চৈতন্য বিকাশ।
ধ্যানে চিত্ত দিবানিশি,　　এ বিশ্ব কাহার লীলা,
ঋষিবাক্যে রাখিয়ে বিশ্বাস॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ॥

উপাসনা।

(শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ)।

"আত্মেত্যেবোপাসীত" আত্মার উপাসনা বিহিত। আত্মজ্ঞানে সর্ববিষয়ক জ্ঞান, আত্মপ্রাপ্তিতে সর্ববিধ প্রাপ্তি, আত্মসুখে যাবতীয় সুখ। আত্মা বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ, বিশ্বপ্রপঞ্চ কার্য্য। একমাত্র মৃত্তিকা জ্ঞান হইলে ঘট শরাবাদি আর পৃথক্ করিয়া জানার আবশ্যক করে না; আত্মজ্ঞান জন্মিলে বিশ্বজ্ঞান আপনিই আয়ত্ত হইয়া পড়ে। "আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেতদ্ বিজ্ঞাতং ভবতি" এই আত্মা বিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়াই বিশ্বাকার ধারণ করিয়াছে—অতএব আত্মপ্রাপ্তি অর্থে সর্ব্বপ্রাপ্তি। "সর্ব্বমাত্মময়ং জগৎ" আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই; তাহা হইলে কাহার জ্ঞান কাহার প্রাপ্তি হইবে?

আত্মসুখ—আত্মানন্দ। সকল আনন্দই সেই আত্মানন্দের আভাস; সেই মহাসাগরোপমের জলকণা মাত্র।

কোনপ্রকার ভেদ থাকিলে অভেদ বা তাদাত্ম্য জন্মেনা; তাদাত্ম্য না জন্মিলে প্রকৃত রসাস্বাদও হয় না। ব্যবধান রসাস্বাদের বিঘ্নকর। যে কোন প্রকার রসের প্রকৃত আস্বাদন করিতে হইলে রস বিষয়ের সহিত তাদাত্ম্য আবশ্যক করে। এই তাদাত্ম্যই কাব্যে তন্ময়তা। এই অভেদই অদ্বৈত। আত্মজ্ঞান স্ব স্বরূপজ্ঞান, মোক্ষ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা, আত্মজ্ঞানে অবিদ্যাধ্বংসভাবী—এ সকলের মূলীভূত ঐ অদ্বৈত বা অভেদ।

দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী সকলেই অভেদের উপাসক। অদ্বৈতবাদী অভেদ পারমার্থিক, ভেদ আরোপিত বলেন, দ্বৈতবাদী ভেদ পারমার্থিক, অভেদ চিন্তয়িতব্য বলেন, ইহাই পার্থক্য। জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মানন্দ গোপীদিগের অহেতুকী ভক্তিজনিত সুখ একই প্রকার। বৈষয়িক সুখমাত্রেই দুঃখমিশ্র অল্প ও ক্ষণিক। পরমার্থ সুখ মাত্রেই নিত্য অতুল্য, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদীর পরমার্থ সুখে ভোক্তার স্বাতন্ত্র্য লোপ এপক্ষে উভয়ই সমান। গোপিকাদের কৃষ্ণ প্রেমে লজ্জা, শালীনতা, কুলধর্ম্ম, সংস্কার—এ সমস্ত কোন ব্যবধানই রচনা করিতে পারে নাই। নহিলে গোপীরা তমালে কৃষ্ণের বর্ণ, যমুনা তরঙ্গ-কাকলীতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি, নয়ন সম্মুখে কৃষ্ণরূপ সর্ব্বদাই দেখিত কেন? তবে যে দুঃখ পাইত, তাহার কারণ,—ঐ অভেদ সর্ব্ব সময়ে বলবান্ থাকিত না; সেই তন্ময়তা বিচ্ছিন্ন হইত। জ্ঞানীরাও নির্ব্বিকল্প সমাধির পর দ্বৈতরাজ্যে আসিতেন, তখন ব্রহ্মানন্দলাভ ঘটিত না। এই অভেদটি অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সেব্য-সেবকভাব ভক্ত-ভগবদ্ভাব বা দাস্য প্রভু সম্বন্ধ জ্ঞানীরা ভাল বাসিতেন না। তখন "সদানন্দস্বরূপঃ শিবোঽহং" ভাব। "তত্ত্বমসি" তুমি ব্রহ্ম এইটি যদি চিন্তয়িতব্য মাত্র হয়, তাহা হইলে অভেদের বল থাকিবে না, ভেদও ভেদমূলক ব্যবধান অপরিহার্য্যই থাকিবে। চিরসুখ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত জন্মে না। মোক্ষ স্বর্গাদিবৎ আগন্তুক হইলে তাহার নাশাপত্তি রহিত করিবে কে? দ্বৈত ও অদ্বৈত মুক্তিলাভে প্রভেদ যথেষ্ট থাকিলেও মূলীভূত তাদাত্ম্য উভয়তই প্রয়োজনীয়।

এই অভেদজ্ঞানই ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়। ইহাই উপনিষদ্-বেদ্য ও স্বানুভবনীয়। যিনি "আত্মানমেবাবেৎ" আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনিই

ঔপনিষদিক বা বেদান্তী তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মবাদী। আমি ভিন্ন, শব্দাদি বিষয় ব্রহ্মভিন্ন, শব্দাদি আমাদের গ্রাহ্য বিষয় ও ভোগ্য—এই সকল ভাবই ভেদজ। এই ভেদমূলক অজ্ঞানের রাজ্যেই অভিমান লজ্জা সঙ্কোচ স্বার্থপরতা। যিনি অদ্বৈত অভয় জানেন—তাঁহার ভয় কাহা হইতে? শোচ্য কে? শোকই বা কি? অতএব এই একত্ব জ্ঞানই উপাসনার চরম আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। নানাজ্ঞান অকর্ত্তব্য। নানাত্বদর্শী জন্মমৃত্যুলক্ষণ সংসারে গতায়াত করিতে বাধ্য হয়।

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" যাহারা একবস্তুকে নানা দেখে তাহারা মৃত্যু হইতে মৃত্যু লাভ করে।

কারণ ও কার্য্যভেদে উপাসনা দ্বিবিধ। কারণ-উপাসনাই আত্মোপাসনা। এইবার কার্য্যোপাসনার কথাই বলি। কার্য্য দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত—এই দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। অব্যক্ত—শক্তি। শক্তির আত্মভূত কার্য্য—এই কারণে সর্ব্বত্র শক্তিকে পৃথক করিয়া গণনা করা হয় নাই। শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি। যথন শক্তি ও শক্তিমানে—অভেদ অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির মত। শক্তি সিসৃক্ষা—মায়া। ইচ্ছা ইচ্ছাময় একই। দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি ব্রহ্মশক্তি। আমরা শক্তি ত্যাগ করিয়া—শক্তিমানের শক্তিমানকে ত্যাগ করিয়া শক্তির কল্পনা করি না।

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ" ইহাই ব্রহ্মগায়ত্রী, হরগৌরী, লক্ষ্মীনারায়ণ।

কারণ—ব্রহ্ম, কার্য্যের আত্মভূত অব্যক্ত শক্তি, ব্যক্ত—কার্য্য। (শক্তি ও কার্য্য উভয়ই কার্য্য) এই কার্য্যোপাসনার নাম প্রতীক। প্রত্যচ শব্দের অর্থ অভিমুখবর্ত্তিতা। অশব্দ অস্পর্শ ব্রহ্ম চিন্তাগম্য করিবার জন্য একটি আলম্বন গ্রহণের আবশ্যক। এই আলম্বনার্থ গৃহীত অভিমুখীভূত আলম্বন বস্তুই প্রতীক। যেমন প্রাণোপাসনা, প্রকৃতি উপাসনা প্রস্তরময়ী বা মৃন্ময়ীর পূজা।

এক্ষণে সংশয় হয় যে, "মূর্ত্তি পূজা যদি প্রতীক, তবে ত উৎকৃষ্ট কল্প নহে। আর মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" মুক্তিলাভ ঘটা দূরের কথা, জন্মইত অপরিহার্য্য"। এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রতিমা বা প্রাণোপাসনাদি উৎকৃষ্ট কল্প ত নহেই। তবে নানাত্বদর্শিতা দোষ আসিতে

পারে না; কারণ উপাসকের যদি এই বিশ্বাস থাকে ঈশ্বর এক ও সর্ব্বব্যাপী। আমাদের বিচ্ছিন্ন সান্ত চিন্তাশক্তি এই স্বরূপের ইয়ত্তা করিতে পারে না বলিয়াই আলম্বন স্বীকার। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। তাহা হইলে নানাত্ব দর্শিতা দোষ হইবে কেন? যদি উপাসক বুঝে যে, কৈলাস বা বৈকুণ্ঠ ব্যতীত ঈশ্বর অন্যত্র নাই বা এই মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোন মূর্ত্তি ঈশ্বরের নাই বা মূর্ত্তিই তাঁহার স্বরূপ, তবেই সেই উপাসক ভ্রান্ত। একই অগ্নিকে কখন বাড়বাগ্নি কখন বনাগ্নি কখন বা উদরাগ্নি বলিয়া ব্যবহার নানাত্ব দর্শনের পরিচায়ক নহে।

উপাসনা তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা আমরা প্রথম নির্গুণোপাসনা, দ্বিতীয় তটস্থরূপোপাসনা, তৃতীয় কার্য্যস্বরূপ প্রকৃতি উপাসনা। প্রতিমাপূজাও এই তৃতীয় স্তরের অন্তর্গত।

উপনিষদে নির্গুণতত্ত্ব, বেদ ও উপনিষদেও সগুণ ও প্রকৃতি-উপাসনাতত্ত্ব বিবৃত আছে। আত্মেত্যেবোপাসীত" নির্গুণোপাসনার কথা। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" "মায়িনন্ত মহেশ্বরং" তটস্থরূপের কথা। প্রকৃতি-উপাসনার ব্যাপার বৈদিক কালে খুবই প্রচলিত ছিল। এক্ষণে প্রতিমা পূজা ঐ প্রকৃতি উপাসনার স্থান অধিকৃত করিয়াছে। এই কার্য্যোপাসনা যে প্রতীকোপাসনা, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনাই হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান —"ভূতেভূতে ব্যবস্থিত" আত্মজ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু স্বরূপোপাসনার সম্ভাবনা নাই। ধ্যেয় বস্তুতে ধ্যাতার সভক্তিক আরাধনাই উপাসনা। ধ্যানই উপাসনার প্রধান অঙ্গ। সেই ধ্যানই ত ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের একাগ্রীকরণ। এই ধ্যান করিতে হইলেই আকারের আবশ্যক। আকার না থাকিলে কাহার চিন্তা হইবে? সূর্য্য আকাশ বায়ু বা ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা ব্যতীত চিন্তনীয় কি আছে? মানব সান্ত পরিচ্ছিন্ন চিত্ত লইয়া কখন অমূর্ত্ত নিরাকার চিন্তা করিয়াছেন? তবেই ধ্যানের জন্য আলম্বন গ্রহণীয়। ধ্যেয় ধ্যাতৃভেদ, উপাস্য উপাসক পার্থক্য ব্যতীত উপাসনাই হয় না। ভেদজ্ঞান ব্যতীত উপাসনার সত্তাই নাই। অদ্বৈতজ্ঞান আকাঙ্ক্ষণীয় হউক, উপাসনা দ্বৈতমূলক। জীব ব্রহ্ম অভেদজ্ঞান জন্মিলে "কা কেন কমুপাসীত" কে কাহার কি জন্য উপাসনা করিবে? উপাসনা মাত্রেই আরোপিতের উপরে। জড়জগত

চৈতন্যোপাধিক,—তাহা হইলে উপাসনা ঔপাধিক। "আত্মার অভিমুখবর্ত্তিতা নাই কাজেই প্রতীকত্ব নাই" ইহা মানা যায় না। যখন জগৎ তাঁহার কার্য্য। কারণই কার্য্যাকারে পরিণত—তখন কার্য্যের উপাসনায় কারণোপাসনাই হয়। কারণের ব্যক্ত অবস্থা কার্য্য; মৃত্তিকার ব্যক্তাবস্থা ঘটাদি।"

কোন কোন নিরাকারবাদী বলেন—"ব্রহ্ম বা আত্মা নিরাকার অরূপ। আকার বা রূপ সাবয়বের হয়। ব্রহ্ম বা আত্মা নিরবয়ব। সাবয়ব হইলে অবয়বের ক্ষয়বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—তাহা হইলে অনিত্যত্ব দুর্ব্বার হইয়া উঠে। সেই আত্মার রূপ বা আকার কল্পনা মাত্র। যাহা কাল্পনিক তাহা মিথ্যা। সেই আকার বা রূপ কল্পনা করিয়া যে উপাসন—তাহা মিথ্যা। তাহা দ্বারা নিত্যবস্তু লাভ করা যায় না। অনিত্য দ্বারা নিত্য বস্তু কি কখন লাভ হইতে পারে? নিরাকার উপাসনা কঠিন, সাকার বা মূর্ত্তিপূজা সহজ—তাহা বলিয়া সত্য ত্যাগ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইলে কি হইবে? আত্মা সর্ব্বব্যাপক, ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত—এই স্বরূপ তত্ত্বের আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। ভেদজ্ঞান এই স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া আছে, তাহার দূরীকরণার্থ অনুশীলন না করিয়া ভেদজ্ঞানের প্রশয় দিলে কি ফল? অবিদ্যা গ্রন্থি কাটাইলে সৎস্বরূপ উপলব্ধ হইবে। মেঘ সরিয়া যাইলেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মজ্যোতির স্ফুরণ হইবে।

ক্রমশঃ।

কর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা।

(শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, বার-এট-ল)

———০:*:০———

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দর্শনশাস্ত্রাদির অনুশীলন সম্বন্ধে ভারত যে শ্রেষ্ঠ, ইহা অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিককেও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। মানব জীবনের রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস আমাদের প্রাচীন ঋষিরা যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ কোন দেশের মনীষিগণের দ্বারা কৃত হয় নাই একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এবং তাঁহারা যে ঐ বিষয়ে সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনরূপ কারণ দেখা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে বলেন যে, ভারতীয় দর্শনকার সকলেই

অশিববাদী (pessimistic) ছিলেন। বাস্তবিক আমাদের ষড়দর্শন এবং বৌদ্ধ জৈন শাস্ত্রাদিতে ভূয়োভূয় একথা প্রচার করা হইয়াছে যে, সংসার দুঃখময়। এখানে দুঃখ বলিয়া যাহা কিছু আমরা জানি, তাহা দুঃখ ত বটেই প্রত্যুত, যাহাকে সুখ বলিয়া আমরা গণনা করি এবং প্রীতির উদ্দেশে যাহার পশ্চাতে ছুটিয়া থাকি তাহাও দুঃখের কারণ। যেহেতু সেগুলির আহরণে ক্লেশ, সংরক্ষণে ক্লেশ, পাছে চলিয়া যায় এই ভাবনাতেও ক্লেশ এবং তথাকথিত সুখের অবসানেও আত্যন্তিক ক্লেশ ভোগ হইয়া থাকে। অতএব সাময়িক ভাবে দুঃখের অবসান, যাহা আমরা এ সংসারে মধ্যে মধ্যে সম্ভোগ করিয়া থাকি, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির বা চির-কালের জন্য দুঃখের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কি উপায়ে সম্ভব, সেই বিষয়েরই সম্যক আলোচনা করিয়া তাহার নির্দ্ধারণে আমাদের ঋষি মুনি ও মহাপুরুষ-গণ যত্ন পাইয়া সফলকাম হইয়াছেন।

সংসার দুঃখের আলয়, শুধু যে তাঁহারাই একথা বলিয়া গিয়াছেন এমন নহে। আমার বোধ হয়, প্রাচ্য জগতের অধিকাংশ দ্রষ্টারই (seer) এই মত। মুসলমানেরাও বলেন যে, সুখের পরব ঈদ্ একদিন মাত্র স্থায়ী আর শোকের পরব মহরম দশদিন কাল ব্যাপী। এই অনুপাতে আমরা সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। আমাদের চরম দর্শন বেদান্ত বৈজ্ঞানিক ভাষাতে সুযুক্তি সহকারে একথা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অজ্ঞান বা অবিদ্যাই আমাদের সকল প্রকার দুঃখের একমাত্র কারণ; এবং ইহাও উক্ত দর্শনের দ্বারা নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, ব্যবহারিক জগতের একমাত্র ভিত্তিই অবিদ্যা, সুতরাং ব্যবহারিক জগতের যে সমস্তই দুঃখময়, তাহা আর পাশ্চাত্য জগতকে বুঝাইতে বেশী কষ্ট হইবে না। তাঁহারা যদি একটু প্রণিধান করিয়া মানব জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন, দেখিতে পাইবেন যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ই জীব দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। "Life is not worth living"—জীবিত থাকায় কোনই লাভ নাই, একথা ত ইউরোপীয় দার্শনিকদেরই। ইউরোপ খণ্ডের অবস্থা সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, মানবজীবনে এমন কোন সুখ ভোগ হয় না যাহার জন্য এত বেগ পাইয়া প্রাণধারণ করা প্রয়োজনীয়, সেই শ্রেণীর দার্শনিকগণ এই তথ্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ক্ষণজন্মা মনীষী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার

গোরক্ষপুরের অভ্যাসী যোগী

স্বামী গঙ্গানাথ।

উঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। তাহা হইলেই দেখা গেল, অশিববাদ আমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে।

সভ্যভব্য ও শিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি সরলভাবে বলিতে পারেন যে, জড় জগতের সুখাদি ভোগ করিয়া তিনি সংসারে সন্তুষ্ট চিত্তে বিরাজ করিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইতে যে, তিনি মোহের নেশার ঘোরে একরূপ অসাড়-ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এ সংসারে যিনি যত ঋদ্ধি সম্পন্ন হউন না কেন, যত প্রকার ভোগ বিলাসের মধ্যে নৃত্যকুর্দ্দন করুন না কেন, একথা তিনি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, জরা ব্যাধি শোক আদির একটীও তাঁহাকে কখনও আক্রমণ করে নাই বা করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে যত কিছু সুখ ভোগ করিয়া থাকি না কেন, যখন ত্রিতাপের একটীও আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে, তখন সুখগুলি দীর্ঘকাল ব্যাপী হইলেও তাহাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হয়, এবং বর্ত্তমান তাপজনিত ক্লেশকেই যেন জন্মের সঙ্গী বলিয়া মনে হয়। তবেই বুঝিতে হইবে যে, দুঃখের প্রাবল্য আমাদিগকে যে পরিমাণে অভিভূত করে, ভোগ বিলাস আমাদিগকে সে পরিমাণ সুখ দিতে পারে না। আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাতে ইহা লিপিবদ্ধ আছে যে, বিশেষ দুঃখ ক্লেশের দিন আমরা যে ভাবে স্মরণ করিয়া বারংবার উল্লেখ করি, সুখের সময়গুলির ছাপ আমাদের হৃদয়ে সে ভাবে থাকে না। যদি জীবনের কোন দিন কোন বিপদে পড়িয়া বা অনাহারে ক্লেশ পাইয়া থাকি, তাহা কখনই ভুলি না, কিন্তু কত ঘৃত দুগ্ধ ছানা নবনীতাদি উপাদেয় সামগ্রী জীবনে কতবার আহার করিয়াছি, সে কথা স্মৃতিপটে নাই বলিলেই চলে। অবশ্যই ইহার সমীচীন কারণ অন্যত্র পাওয়া যায়, সে বিষয়ে এখানে কোন উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখন দেখা যাউক, কি কি উপায়ে আমরা দুঃখের হাত এড়াইতে পারি। আমাদের দর্শন—বেদান্ত, যাহাকে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ অধুনা Ultimate Science বা চরম বিজ্ঞান নামে অভিহিত করিতেছেন, তিনি ত এক কথায় সারিয়া দিলেন যে, আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবের দুঃখনিবৃত্তির আর কোনও উপায় নাই। সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ষট্‌সম্পত্তি উপার্জ্জন একান্ত আবশ্যক। * প্রকৃত পক্ষে সাধন চতুষ্টয় মধ্যে এই সাধনটী বিশেষ কষ্টসাধ্য;

* শম, দম, শ্রদ্ধা, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধান।

কেন না ইহারই উপরে আর তিনটী সাধন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পরন্তু এই সাধন কি কি উপায়ে ব্যবহারিক জগতে আমরা সম্পাদন করিতে পারি বেদান্ত সে বিষয়ে বিশেষভাবে কিছু বলেন নাই, বলিবার প্রয়োজনও হয় নাই। আমাদের কর্ম্মশাস্ত্র যাহা আমাদেরই খাস সম্পত্তি, পৃথিবীর আর কোন দেশের লোক যাহার সম্বন্ধে সম্যকরূপে অজ্ঞ, কেবলমাত্র সেই কর্ম্মশাস্ত্রই এ বিষয়ে আমাদিগকে পথ দেখাইতে প্রস্তুত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আহার নিদ্রা উত্থমাদি যাহা কিছু আমরা করিয়া থাকি, তাহার কোন্‌টী কি প্রকারে করিলে কিরূপ ফল হয় এবং সেই ফল দ্বারা আমাদের কতদূর উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়া থাকে, তাহা বৈজ্ঞানিক হিসাবে বুঝাইয়া দিতে ভারতের এই অমূল্য সম্পত্তি কর্ম্মশাস্ত্রই সমর্থ।

কর্ম্মশাস্ত্র বলেন যে, বিশ্বসংসারের যাবতীয় বিধান যেমন ঈশ্বরের মহাশক্তির প্রকাশমাত্র; সুতরাং কর্ম্মবিধানও ঠিক তাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় জড় জগতের নিয়মাদি যেমন আমরা অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মানি, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের প্রণালীগুলিকে আমরা সেরূপ সম্মান দিতে শিক্ষা করি নাই। ইহার একমাত্র কারণ সভ্যাসভ্য উভয় জগতের লোকই বর্ত্তমান সময়ে অতীব স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন। যাহা কিছু পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর, তাহাকেই আমরা প্রত্যক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করি, আর যেগুলি অতীন্দ্রিয় ব্যাপার তৎসম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এত বেশী যে, আমরা সদর্পে তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। বিশেষ পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে পৃথিবীর সকল লোকেই এতদূর বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছে যে, যেটা আমরা বুঝিতে না পারি, সেটাকে অবাধে উড়াইয়া দিতে আমরা প্রস্তুত হই; যেন, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপরেই বিশ্বসংসারের সমস্ত সত্যের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে! এ অবস্থায় সূক্ষ্ম জগতের বিদ্যমানতা স্বীকার করিবার শক্তি আমাদের কোথায়? কিন্তু একবার ভাবি না যে, জড়জগতেই এরূপ সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের আবিষ্কার যদি না হইত, কত ব্যাপার যাহা এখন আমরা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহা আমাদের পক্ষে অবিদ্যমান থাকিত। নিউটন যখন বর্ত্তমান সময়ের locomotive ইঞ্জিনের আভাস দিয়া সতেজে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এমন সময় আসিবে যখন পশ্বাদির

সাহায্য ব্যতীত মানুষ অন্য উপায়ে দিনে শত শত মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে, তখন ভলটেয়ারের (Voltaire) ন্যায় মনীষি ব্যক্তিও অসঙ্কুচিত চিত্তে উহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বলিয়া এই বিষয়ে নিউটনের বুদ্ধির অল্পতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন যদি ভল্‌টেয়ার থাকিতেন, ষ্টীমার রেল, এরোপ্লেনাদির দ্বারায় মানুষ কি প্রকারে সহজে এবং শীঘ্র দেশদেশান্তরে ভ্রমন করিতেছে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, নিউটনের ভবিষ্যদ্দর্শন কত তীক্ষ্ণ ছিল! নিউটনের উপেক্ষিত ভবিষ্যদ্বাণী যেমন এখন সম্মানিত হইতেছে, আমরা আদরের সহিত বলিতে পারি যে, আমাদের কর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল নিগূঢ় সত্য প্রচারিত আছে, তাহাও এক সময়ে সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত হইবে এবং সে সময় আর বেশী দূরে নাই। ইহার মধ্যেই সে সকলের পরিপোষক অনেক কথা পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শুনিতেছি। বিজ্ঞানানুমোদিত গবেষণাদি দ্বারা প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ মানবজীবন সম্বন্ধে যে সকল সত্যলাভ করিতেছেন, তাহার অনেকগুলি কর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া গণ্য। আমাদের উভয়ের কথা যদি এই ভাবে কড়ায় কড়ায় মিলিতে থাকে, আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সে গুলিকে সহজবোধ্য বলিয়া স্বীকার করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিবেন না।

এখন কথা এই যে, আমরা মনুষ্য পদবাচ্য কিসে? নিকৃষ্ট জন্তুদিগের সহিত আমাদের দেহের তুলনা করিলে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না; কেবলমাত্র মস্তিষ্কের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি শারীরিক প্রবৃত্তিগুলির দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেও মনুষ্যে এবং পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না, কেবলমাত্র চিন্তাশক্তিই মানুষকে "মানুষ" করিয়াছে। যদি আমরাও সাধারণ পশুর ন্যায় শারীরিক প্রয়োজনাদি চালাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা হইলে আমরা উন্নত জীব হইলাম কিসে? যাহাকে ইংরাজীতে Eternal problems of life বলে, সেইগুলি যদি আমাদের গবেষণাধীন না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কোথায়? আমাদের আমিত্ব পদার্থটী কি? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি কোথায় বা যাইব? কি প্রকারে আসিয়াছি, কি প্রকারে যাইব? কেনই বা আসিয়াছি, কেনই বা যাইব? এই সাতটী প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে যিনি কখনও কোন অনুসন্ধান না

করিয়াছেন, তিনি মনুষ্য পদবাচ্য হইবার যোগ্য নহেন। কেন না জগতের আদি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মা উক্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের প্রত্যেকের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, বাকি যে অসংখ্য অগণ্য লোক এ সংসারে আসিয়াছে এবং এখান হইতে গিয়াছে, তাহাদিগের গমনাগমনের কোন প্রকার নিদর্শন পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শৃগাল কুক্কুরের মত সাধারণ লোক আসে এবং যায়। নিকৃষ্ট জন্তুদিগের দেহান্তকালে ময়লা ফেলা গাড়ীতে (Scavengers Cart) লইয়া গিয়া তাহাদের শবের সংকার করা হয়, তৎপরিবর্ত্তে আমাদের মৃতদেহ না হয় একখানা সাধারণ বা বিশিষ্ট খাটে করিয়া যথাস্থানে প্রেরিত হয়। ইহাতে আর বেশী তারতম্য কোথায়? এই জন্যই মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়া গিয়াছেন "তুলসী যব্ জগ্‌মে আয়ো, জগ্ হাসে তোম্ রোয়, এয়সি করনি কর্ চলো, যো তোম্ হাসো জগ্ রোয়" অর্থাৎ যখন তুমি সংসারে আসিয়াছিলে, তোমার শুভাগমনে তোমার আত্মীয় স্বজন সকলেই আনন্দে হাসিয়াছিল, কিন্তু তুমি তখন কাঁদিতেছিলে, মানুষ যদি হইতে চাও এমন কাজ করিয়া যাও, যাহাতে দেহান্ত কালে তুমি হাসিতে হাসিতে যাইতে পার এবং তোমার অভাবে জগতের লোক তোমার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করে। পাশ্চাত্য মনীষী কার্লাইল্‌ও বলিয়া গিয়াছেন "Try to leave the world a little better and beautifuller than you found it"—সংসারকে প্রথম যেমন দেখিয়াছিলে, যদি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল ও সুন্দর করিয়া যাইতে পার, তবেই মনুষ্যত্ব নচেৎ তোমার আসা যাওয়া বৃথা।

এই কথা শুনিলে সাধারণ মানুষের মনে এই প্রশ্নগুলি স্বতঃই উদয় হয়:— সংসারটাই বা কি? আমার শক্তিই বা কতটুকু? সংসারের উন্নতিই বা আমার দ্বারা কি হইতে পারে? এবং উন্নতি করিয়া যাইতে পারিলে আমার অবর্ত্তমানে কাহার কি উপকার হইবে? যদি কিছু হইল তাহাতে আমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি? সংসার ত দেখিতেছি একটা বিষম ব্যাপার। আমার জ্ঞান হওয়া অবধি আমি ত বেশ বুঝিতেছি যে, সংসারে দুঃখের মাত্রাই পৌনে ষোল আনা। এই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাই কি জগতের উন্নতি চেষ্টা? তদ্ভিন্ন জগতের উন্নতির আর ত কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানে যাঁহারা যত্ন পাইবেন, তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ;—সংশয়ী ও বিশ্বাসী।

সংশয়ীর কথা :—

উল্লিখিত মহাত্মা কার্লাইলের নায়ক টিউফেল্‌সড্রকের সঙ্গে সংশয়ী বলেন ;—ভীষণ বিশ্বগ্রাসী অসীম অনন্ত ভাবের মধ্যে ক্ষুদ্রাৎক্ষুদ্রতর ক্ষীণাৎ ক্ষীণতর আমি এক ব্যক্তি। আমার সত্তার সঙ্গে আমি আর কিছুই পাই নাই, কেবল পাইয়াছি দুই চক্ষু যদ্দ্বারা আমি আমার দারুণ হীনতা ও দুর্ভাগ্য দেখিতে পাই ! * এ সংসারে ঠিক সোজা হইয়া চলিতে পারিলে দুঃখ বিপদ না ঘটিতে পারে, কিন্তু ঠিক সোজা হইয়া চলা কি দুর্ব্বল মানুষের কাজ ? সুতরাং এই দুঃখময় সংসার সাগরে আমাকে ভাসিতে হইতেছে। কখন ডুবিতেছি, কখনও উঠিতেছি, আবার কখনও বা হাবুডুবু খাইয়া যেন বিনাশের মুখে পতিত হইতেছি। শুধু যে আমারই এই অবস্থা তাহা নহে, চারিদিকেই এইরূপ হাহাকার রব শুনিতে পাই। ধনী, নির্ধন, মূর্খ, বিদ্বান প্রত্যেকেই যেন জীবনের কোন না কোন সময় "হা ভগবান, আমার দশা এই করিলে!" বলিয়া চীৎকার করিতেছে ; দেখিয়া শুনিয়া আমিও ভাবিতেছি, ভগবান বলিয়া কাহাকে ডাকি ? যদি এ জগতের কেহ দয়াময় স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতা থাকিতেন, তিনি অবশ্য আমাকে এত কষ্টে রাখিতেন না। জ্ঞানের পরিচয় দিয়া কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, আমাদের যত কিছু ক্লেশ সমস্তই আমাদের নিজেদের দোষে ঘটিতেছে, কিন্তু আমি ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বিগত জীবন পর্য্যালোচনা করতঃ যদিও অনেকটা জানিতে পারা যায় যে, নিজের কতকগুলি ত্রুটি হেতু অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে, কিন্তু আবার ইহাও বেশ দেখিতে পাই যে, বহু কারণের এমন সমাবেশ ঘটিয়াছে, যাহা আমি কিছুতেই এড়াইতে পরিতাম না, সেই গুলির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া দিয়া সংসারের দিকে তাকাইলে যে সকল দারুণ ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন সমীচীন কারণ নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ অসাধ্য ব্যাপার। যখন দেখি, ৭।৮ বৎসরের একটী বালক পিতামাতার দোষে ঔপদংশিক ক্ষত রোগে ক্লেশ পাইতেছে, তখন কি মীমাংসা করা উচিত ? ঐ বালক স্বীয় জীবনে এমন কোন গুরুতর অপরাধ করে নাই, যাহার জন্য তাহার ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে, তবে কেন সে বেচারী ক্লেশ পায় ? যদি কেহ বলেন, পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল। তাহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করি। এই বিংশ শতাব্দীর গ্যাস-বিদ্যুৎ-রঞ্জেন কিরণে বাস করিয়া সেকেলে লোকের মত একটা অদ্ভুত মত পোষণ করি

---

* A feeble unit in the middle of a threatening Infinitude, I seem to have nothing given me but eyes whereby to discern my own wretchedness—Teufelsdrokh.

কিরূপে? বাস্তবিক যদি জন্ম জন্মান্তর থাকে, তাহা হইলে অনেকটা গণ্ডগোল মিটিয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বজন্ম পরজন্মের প্রমাণাদি দ্বারা বিষয় পরিস্ফুটরূপে এ পর্য্যন্ত কে বুঝাইয়াছেন? আজ কাল বিজ্ঞান সম্মত যুক্তির দ্বারা সাব্যস্ত না হইলে কেবল কথাই কেহ গ্রাহ্য করে না। সেই বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে আমার বর্ত্তমানের ন্যায় মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা হইলে সকল সন্দেহ দূর হয়, মনকে বুঝাইয়া আশ্বস্ত হইতে পারি। অপর পক্ষে, বিস্তর লোক যাঁহারা সংসারে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় এরূপ আছেন, যাঁহাদের মতে জগতের সর্ব্বশক্তিমান অথচ দয়াময় কর্ত্তা কেহ নাই। সংসার একটী সুবৃহৎ পাশা খেলার আড্ডা মাত্র, এখানে যাহার পাশার যেরূপ দান পড়িতেছে তাহার ঘুঁটী সেইরূপ চলিতেছে। এই দেহাত্মবাদী শ্রেণীর লোক বলেন, এই জন্মই আমাদের প্রথম ও শেষ, আগেও কিছু ছিল না, পরেও কিছু থাকিবে না। যদি তাহাই হয় তবে দুঃখ বিপদের সময় মাঝে মাঝে "হা ভগবান!" শব্দ আপনা আপনি মুখ হইতে বাহির হয় কেন? ওটা কি কথার কথা, আকাশ কুসুমবৎ অলীক? হইতে পারে, উহা অকর্ম্মণ্য অপদার্থ দুর্ব্বলের বুলি মাত্র। কেন না, আমি আর্ত্ত বিপন্ন ব্যক্তিগণ দুঃখ বিপদে কতবার প্রাণের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া "ভগবান" বলিয়া চীৎকার করিয়াছি, কখন ত কোন ফল পাই নাই। যদি কোন প্রকৃত সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ, দয়াল পিতা রূপে বিশ্ব সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বিরাজ করিতেন, তিনি অবশ্যই আমার আর্ত্তনাদে বিগলিত হইয়া আমার উদ্ধার করে প্রয়াস পাইতে ত্রুটী করিতেন না।

ক্রমশঃ

গ্রন্থ পরিচয়।

মালঞ্চ। খণ্ডকাব্য। শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ বিরচিত। চুঁচুড়া আলোচনা সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার পাঠকদিগের নিকট পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থের নাম অপরিচিত নহে। নব্যভারত, ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু পত্রিকা, ব্রাহ্মণ সমাজ, বসুধা প্রভৃতি নানা মাসিক পত্রিকায় তিনি দার্শনিক ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি "অবকাশ" নামে একখানি সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, এক্ষণে "মালঞ্চ" প্রকাশ করিয়া তিনি কবি সমাজে আসন লাভ করিলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় ইংরাজীনবীশ নহেন, সুতরাং তাঁহার "মালঞ্চে" মার্স্যাল নীল,

ওয়ান্টার স্কট অথবা প্যান্সী বা ডাফোডিলের ন্যায় বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট বিজাতীয় কুসুমের সমাবেশ নাই। তিনি যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তেমনি তাঁহার এই "মালঞ্চ" কাঞ্চন, করবীর; সেফালী চম্পক নাগেশ্বর গন্ধরাজ প্রভৃতি দেবপূজার উপযোগী পুষ্পে পরিশোভিত। তাঁহার এই "মালঞ্চের" পুষ্পবাটিকায় প্রবেশ করিলে হৃদয়ে বিলাস লালসা বা ভোগ তৃষায় সঞ্চার হয় না, পরন্তু ইহার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে শান্তির শত ধারায় প্রাণ পরিসিক্ত হয়। সত্য সত্যই "মালঞ্চ" বাঙ্গালী কবির বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। সাধারণতঃ আজকালকার বাঙ্গালা কবিতায় যেরূপ ইংরেজী ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় "মালঞ্চে" তাহার কিছুমাত্র গন্ধ নাই অথচ কি ছন্দের ঝঙ্কারে, কি ভাষার লালিত্যে, কি ভাবের উচ্ছ্বাসে ইহার সকল কবিতাগুলিই প্রাণস্পর্শী।

কবি গ্রন্থারম্ভে সরস্বতী বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন :—

"এমনি করিয়ে বাঁশীটী ধরিয়ে
ভকতি ভরেতে তুলিব তান।
ধমনী নাচিবে পুলকে উঠিবে
আমোদে ভাসিবে আমার প্রাণ।
(আমি) বিজনে বসিয়া, পঞ্চমে তুলিয়া
কোকিলের সনে গাহিব গান।
শারদ প্রভাতে, পাপিয়া যেমতে
হরষিত চিতে তুলে গো তান॥
হাসি হাসি প্রাণে কুসুমের কাণে
পরাণ-মাতানে তুলিব স্বর।
তটিনী সলিলে, ঝিকি মিকি খেলে
অনন্ত নিখিলে করিবে ভর॥
অলি গুণ গান মানিনীর মান
সদৃশ সুতান উঠিবে যবে।
বহিবে উজান, শুনি বীণাধ্বনী॥
শ্যামগত প্রাণ যমুনা তবে॥"

আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কবির এই বাসনা সফল হউক।

"মালঞ্চের" হিমালয়, ত্রিমূর্ত্তি, উবন্তির ভিক্ষা, ত্রিবেণী প্রভৃতি কবিতাগুলি হৃদয়গ্রাহী। শতাধিক পৃষ্ঠায় পঁচিশটী সুখপাঠ্য কবিতায় পূর্ণ এই গ্রন্থখানি ৷৷০ আনা মূল্যে ক্রয় করিয়া পাঠ করিলে পাঠকদিগের সময় ও অর্থ যে সার্থক হইবে, একথা আমারা সাহস করিয়া বলিতে পারি। ইহা সমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

দুকূল পারিকা। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত। নব বিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ॥০ আনা।

তর্কভূষণ মহাশয় বহুদিন হইতে বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৌদ্ধ দর্শনাদির আলোচনা করিতেছেন এবং তৎসংক্রান্ত নানা তত্ত্ব বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি মণিভদ্র নামে একখানি বৌদ্ধযুগের আখ্যায়িকা আমাদিগের ছাত্র মণ্ডলীর নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি আবার এই দুকূল পারিকা নামক বৌদ্ধযুগের, একটি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা বঙ্গভাষায় পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে সকল আখ্যায়িকা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহাতে কেবল নায়ক নায়িকার প্রণয়ঘটিত বিবরণ ও তাহাদের লালসাতৃপ্তির চিত্র প্রকটিত হইয়া থাকে। সংযম, বৈরাগ্য, অক্রোধ, ক্ষমা প্রভৃতি মনুষ্যত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকল কিরূপে মানব হৃদয়ে বিকশিত হইয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, এরূপ চিত্র সাধারণ বাঙ্গালা আখ্যায়িকায় কদাপি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বৌদ্ধসাহিত্যে এইরূপ নীতিগর্ভ অথচ চিত্তরঞ্জিনী আখ্যায়িকা অনেক আছে। দুকূল পারিকা তন্মধ্যে একখানি। আজকাল আমাদের দেশের অনেক পাঠকের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উপন্যাস আখ্যায়িকা প্রভৃতি পাঠে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। ডিটেকৃটিভের কাহিনী বা গুপ্তকথা শ্রেণীর গ্রন্থের পরিবর্ত্তে যদি তাঁহারা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন আনন্দ উপভোগ করিবেন, তেমনই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্চ নীতিতত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়া উপকার লাভ করিবেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের ভাষা যেমন সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী তাঁহার বর্ণনা শক্তিও তেমনি মনোহারিণী। তিনি দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁহার লিখন ভঙ্গী ঔপন্যাসিকের ন্যায়। তাঁহার রচনা পাঠ করিতে পাঠকের কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয় না। বরং একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে তাহা শেষ না করিয়া তৃপ্তি হয় না। আমরা বাঙ্গালা পাঠক পাঠিকাদিগকে বিশেষতঃ যুবকযুবতীদিগকে তর্কভূষণ মহাশয়ের মণিভদ্র ও দুকূলপারিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থ পাঠে একাধারে হৃদয়ে আনন্দ লাভ ও ধর্ম্মতত্ত্বে জ্ঞান লাভ হইবে। এহেন গ্রন্থ প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

সমাজ—

৺তারকেশ্বরের মন্দির।
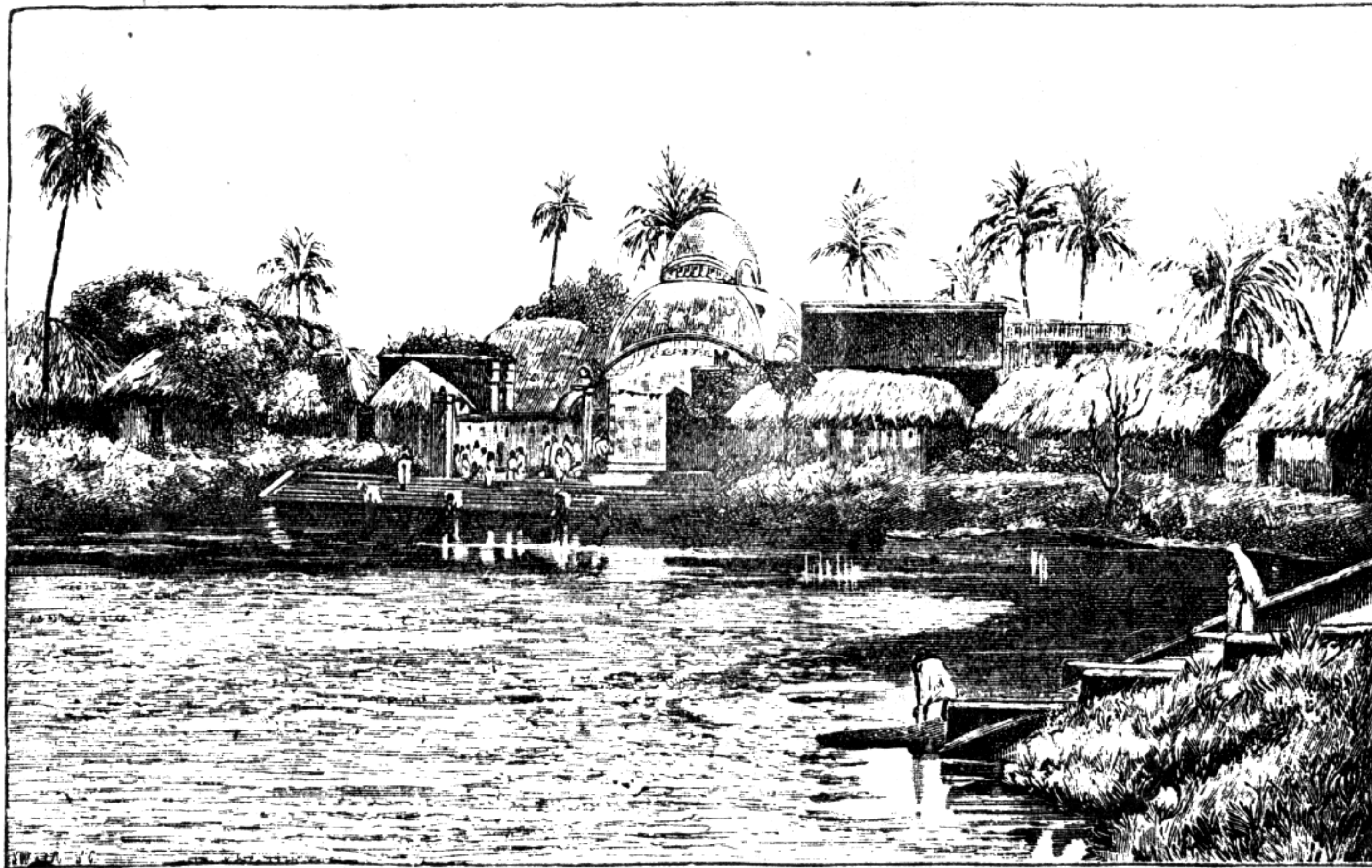
হুয়েন্থসাং যে সময়ে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে নালন্দায় যে সকল মহামতি ভিক্ষু অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপাল অন্যতম। এই ধর্ম্মপাল কাঞ্চী নগরীতে পূর্ব্বে বাস করিতেন। থেরী-গাথা নামে যে প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে, তাহার পরমার্থদীপনী নামে যে প্রসিদ্ধ টীকা আছে, অনেকের মতে ঐ টীকা এই ধর্ম্মপাল প্রণীত। কেহ কেহ পরমার্থ-দীপনীকার ধর্ম্মপাল এবং নালন্দানিবাসী ধর্ম্মপাল যে একব্যক্তি নহেন, তাহাও বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সন্দেহের কারণ এই যে, থেরীগাথা মহাযান সম্প্রদায়ের পুস্তক বলিয়া পরিগণিত নহে। অথচ ধর্ম্মপাল নিজে একজন মহাযান সম্প্রদায়ের সুপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু বলিয়া প্রতীত ছিলেন। যাঁহাদিগের মতে পরমার্থদীপনীকার ধর্ম্মপাল এবং এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধর্ম্মপাল একই ব্যক্তি, তাঁহারা কিন্তু বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মপাল পূর্ব্বাবস্থায় হীনযান সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট ছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই তিনি থেরিগাথার টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের পর নালন্দায় আসিয়া তিনি হীনযান সম্প্রদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাযান মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি বহুবৎসর ব্যাপিয়া নালন্দায় অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শেষাবস্থায় তিনি সুবর্ণদ্বীপে অর্থাৎ লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৬৩০ শতাব্দী হইতে ৬৪০ শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে কয়জন অধ্যাপকের নাম দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে জয়সেন এবং চন্দ্রগোমীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রগোমীনের সঙ্গে চন্দ্রকীর্ত্তি নামে একজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষুর বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই উভয়েই নিজ নিজ মত স্থাপন করিবার জন্য বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গুণমতি নামে আর একজন ভিক্ষু ঐ সময়ে নালন্দায় অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বসুবন্ধু প্রণীত অভিধর্ম্ম কোষের উপর একখানি সুন্দর টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গুণমতির একজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের নাম বসুমিত্র। বসুমিত্র অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যায় একখানি টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই বসুমিত্রকেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কাশ্মীর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বসুমিত্র হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সময়েই নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও তিনজন প্রসিদ্ধ ভিক্ষুর নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ভব-বিবেক, বুদ্ধপালিত এবং রবিগুপ্ত। এই রবিগুপ্ত অসঙ্গের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ

কবিও ছিলেন। এইরূপে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ও বিস্তৃতির পরিচয় প্রকৃষ্টরূপ পাওয়া যায়। এই সময়েই নবোদিত মহাযান সম্প্রদায়ের সহিত হীনযান সম্প্রদায়ের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে উভয় ধর্ম্মমতেরই বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল এবং উভয় মতেরই সমর্থক সুপ্রসিদ্ধ ভিক্ষুগণ নিজ নিজ পাণ্ডিত্য এবং গবেষণার বিমল জ্যোতিতে ভারতের জ্ঞানাকাশকে সমধিক উজ্জ্বলিত করিয়াছিল। ফাহিয়ান এবং হুয়েন্থসাংয়ের লিপিদ্বারায় এই সকল ভিক্ষু পণ্ডিতগণের নাম এবং পরিচয় আমরা প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ক্রমে প্রাচীন সম্প্রদায় অর্থাৎ হীনযান সম্প্রদায় ভারতে দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, যদিচ তাঁহারা মুখে আপনাদিগকে হীনযান সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া জনসমাজে খ্যাপন করিতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের অন্তরে মহাযান সম্প্রদায়ের মতও প্রভাব ক্রমে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রকৃত কথা বলিতে কি, ফাহিয়ানের সময়ে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায় অপেক্ষা হুয়েন্থসাংয়ের সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায় সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক ছিলেন অর্থাৎ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপ যে প্রকার জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ঐ সম্প্রদায় অত্যন্ত বিস্তৃতি এবং প্রভাব লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭৫০ খৃষ্টাব্দের পর এই সম্প্রদায়ের আর বিশেষ প্রভাব বা পাণ্ডিত্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ের শেষ সুপ্রতিষ্ঠিত আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি। কথিত আছে যে, এই ধর্ম্মকীর্ত্তি মীমাংসা বার্ত্তিককার প্রবল বৌদ্ধশত্রু কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক; কিন্তু অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই বিষয়ে সন্দিহান; কারণ, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, চৈনিক পরিব্রাজক ইত্সিং যে সময়ে ভারতবর্ষে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এইরূপ বলেন নাই যে, ঐ ধর্ম্মকীর্ত্তি তখনও জীবিত ছিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ মহাপ্রভাবশালী বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবদ্দশায় যদি ইত্সিং ভারতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিতই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, অন্ততঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না বলিয়া খেদও প্রকাশ করিতেন। তিনি ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন অথচ তাঁহার তাৎকালিক জীবনসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, ইহা দ্বারা

স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইত্‌সিং যে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে ধর্ম্মকীর্ত্তির দেহাবসান হইয়াছিল, সুতরাং উক্ত ধর্ম্মকীর্ত্তি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক কিছুতেই হইতে পারেন না।

কুমারিল এবং শঙ্করাচার্য্য উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল শত্রু ছিলেন, ইহা পরবর্ত্তী বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে এই দুই জনেরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রতিভোজ্জ্বল বাদ বিচারের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে অপসৃত হইয়াছিল। ইতিহাস কিন্তু আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, আচার্য্য শঙ্করের অন্তর্দ্ধানের পর পাঁচ বা ছয় শতাব্দীকাল পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের বহু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, আচার্য্য শঙ্করের তর্কের প্রভাবে বৌদ্ধ মতের প্রতি বিজ্ঞলোকের আস্থার হ্রাস হইলেও, তাঁহার জীবদ্দশাতেই যে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের একেবারেই উচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। তিনি স্রোত ফিরাইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই স্রোত প্রবল হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষকে সমূলে ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিতে যে বহুশতাব্দী অপেক্ষা করিয়া সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমার বোধ হয়, মহম্মদীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর, ভারতবর্ষে মহাযান সম্প্রদায় কিভাবে প্রবর্ত্তিত ছিল, ইতিহাসে তাহার নিদর্শন অতি অল্পই পাওয়া যায়। রাজচক্রবর্ত্তী কনিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত তিনশত বৎসর কাল ব্যাপিয়া মথুরা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে মহাযান সম্প্রদায় বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কেবল মহাযান সম্প্রদায় কেন, ঐ সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল প্রদেশে জৈন সম্প্রদায়ও বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া কাবুল, কাশ্মীর এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মহাযান সম্প্রদায় যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিকা, অমরাবতী এবং কার্লিতে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারাও ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষিণ পশ্চিম

কতকগুলি শিলালিপি যাহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল এবং যাহাকে শ্রীপলেমিক শিলালিপি বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অমরাবতীতে মহা সাংঘিক সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বহু সংঘারাম এবং বিহার ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তত্তদ্দেশে বিশেষ ভাবে প্রচার করিতেছিল। ঐ সময়ে কার্লিতে ভগবান বুদ্ধদেবের একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান ছিল। নাসিকের ভাদ্রজালিক নামে যে গুহা আছে, তাহাও তৎকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে।

ফাহিয়ানের বর্ণনা অনুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে মথুরা, পাঞ্জাব ও উদয়ন প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ উন্নত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল এবং মথুরার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশেও বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু তিনি নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রকার উল্লেখ করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধগণের সর্ব্ব প্রধান বিদ্যাপীঠরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তাঁহার শ্রদ্ধাপূত সাহায্য লাভে ভারতের মধ্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম—বিশেষতঃ মহাযান সম্প্রদায় বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। পরিব্রাজক হুয়েন্থসাং সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের শিলাদিত্য এই নামে পরিচয় দিয়াছিলেন। হুয়েন্থসাংয়ের মতে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত একজন গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও তৎকালে প্রচলিত ভারতের অন্যান্য ধর্ম্ম মতের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। আমরা বিবেচনা করি যে, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি যে প্রকার বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ করিতেন না, মহাযান সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার সেইরূপ কোন বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পাইত না। তিনি যে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ ছিলেন, ইহা কোন প্রকারেই বিশ্বাস্য নহে। আমাদিগের মহাকবি বাণভট্ট তাঁহারই সভায় সভাপণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাকবি বাণ নিজে একজন পরম শ্রদ্ধালু সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনকে মহাপাশুপত বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন যদি বাস্তবিকই বৌদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে তদীয় সভাপণ্ডিত কখনই তাঁহার এইরূপ আখ্যা

প্রদান করিতে সাহস করিতেন না। তাহা ছাড়া ইতিহাস পাঠে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের এক বিধবা ভগিনী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম ছিল রাজ্যশ্রী। গ্রহবর্ম্মণ নামে এক ক্ষত্রিয় নরপতির সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। যাহাই হউক, ইহা স্থির যে, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের কোন প্রকার বিরোধ উপলক্ষিত হইত না। তাঁহার সুনীতি শাসিত বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণেরই শান্তি ও সুখ অব্যাহতছিল।

কাশ্মীর প্রদেশেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার যে বিশেষরূপ হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা দুর্লভবর্দ্ধনের রাজত্বকালে যদিচও শৈবধর্ম্মের বিস্তার অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, তথাপি রাজা দুর্লভবর্দ্ধন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণেরও যে দান ও মানাদির দ্বারা যথেষ্ট সৎকার করিতেন, তাহারও পরিচয় ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এইরূপ নেপাল প্রদেশেও মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণ যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ; তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ নেপাল দেশের ইতিহাসে উপলব্ধ হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত অবনতির সূত্রপাত হয়। পশ্চিম ভারতে আরবগণের প্রবেশের সময় হইতে ঐ প্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম যে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহা ঐতিহাসিকগণের নিকট অবিদিত নহে।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থা ও ভারতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব।

সিংহলেশ্বর অগ্রবোধির রাজত্বকালে ঐ দ্বীপে পরস্পর বিবদমান বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে তামিলগণ ভারতবর্ষ হইতে পুনঃপুনঃ লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ পূর্ব্বক আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাদিগের আক্রমণের প্রভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ স্বদেশ ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্ম পরস্পর মত বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই কারণে বিজেতা তামিলগণ

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রতি যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার অনেক বীভৎস চিত্র এখনও লঙ্কাদ্বীপের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ১১৫৩ হইতে ১১৮৭ বর্ষ পর্য্যন্ত সঙ্ঘবোধি পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে সিংহল-দ্বীপে বিভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর মত বিরোধের সামঞ্জস্য দ্বারা একটা বিরাট একতা স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে অনুরাধপুরে যে মহান্ বৌদ্ধ সংঘ আহূত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিংহলীয় সকল ভিক্ষু সম্প্রদায়ই ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ১১৮৭ হইতে ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কীর্ত্তিনিশাঙ্কমল্লের রাজত্বকালে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য যে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা কীর্ত্তিনিশাঙ্কমল্ল গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, আমারই প্রযত্নে তিন নিকায়ের একতা সম্পাদিত হইয়াছিল, অনেককাল হইতেই ঐ গ্রন্থত্রয় এক হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি অনেক বৌদ্ধ মন্দির এবং বিহারের জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ সকল বিহার ও মন্দির তামিলগণের আক্রমণ কালে তাহাদিগের অত্যাচারে এক প্রকার বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে কলিঙ্গ হইতে মাঘনামে একজন নরপতি লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। ইনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সিংহলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত বিদ্বেষ্টা ছিলেন। ইঁহার একবিংশ বর্ষব্যাপী রাজত্ব-কালে সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ নানা প্রকারে নিপীড়িত হইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৫০ খৃষ্টাব্দে বিজয়বাহু নামে একজন নরপতি কিছুদিনের জন্য দেশমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ আবার শান্তির সুখ অনুভব করিতে পারিয়া-ছিলেন। বিজয়বাহুর পুত্র তৃতীয় পরাক্রমবাহু ১২৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি একজন ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে সিংহলদ্বীপে সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল। তৎকালে সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকৃষ্ট উপদেষ্টা না থাকায় তিনি ভারতবর্ষ হইতে অনেক সুপণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বিশেষ সম্মানের সহিত লঙ্কাদ্বীপে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভিক্ষুগণের

সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য কোন ঘটনাই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এখনও সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম শৈব, মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয়ধর্ম্মের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যদিও সাধারণ লোকের উপর আর এখন পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারেন না, বিহার বা সংঘারামের যদিও পূর্ব্বকালের ন্যায় উন্নতি এখনও পরিলক্ষিত হয় না, তথাপি ভগবান বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এখনও সিংহলদ্বীপে অধিকাংশলোক কর্ত্তৃক যথেষ্ট সম্মান ও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ই ভারতে অবিমিশ্র বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রজপ, শিবশক্তির উপাসনা, সমাধি ও বলিদান প্রভৃতি যেরূপ হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে প্রচুরভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেই প্রকার বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রে প্রজ্ঞা (যাহা হিন্দু তন্ত্রে শক্তির প্রসিদ্ধ স্থলাভিষিক্ত) এবং ধ্যানী বুদ্ধ (যাহাকে এক প্রকার হিন্দুতন্ত্রে প্রসিদ্ধ মহাদেবের সদৃশ বলা যাইতে পারে।) ইহাদের উপাসনা, ইহাদিগের বীজ মন্ত্র জপ এবং উদ্দেশে বলিদান প্রভৃতি বৌদ্ধ তন্ত্রেও প্রচুর ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দু তন্ত্রে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির বিষয় যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বৌদ্ধ তন্ত্রেও উহা ঠিক সেই ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। হঠযোগ এবং রাজযোগ এই উভয় বিধ যোগই হিন্দু তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধ তন্ত্রে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তারানাথের মতানুসারে অসঙ্গ হইতে ধর্ম্মকীর্ত্তির সময় পর্য্যন্ত ভারতে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল। পাল বংশীয় নরপতিগণের রাজত্বকালে মন্ত্রবজ্রাচার নামে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায় বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কথিত আছে, এই সময়ে বহু তান্ত্রিক সিদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষগণ সিদ্ধির প্রভাবে নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনা দ্বারা জনসমূহকে আশ্চর্য্যান্বিত ও মোহিত করিতেন। পালবংশীয় নরপতিগণের পর সেন বংশীয় নরপতিগণ পূর্ব্বভারতে আধিপত্য লাভ করেন। ইহারা যদিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তথাপি ঐ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষ

প্রকাশ করিতেন না। ইহাদিগেরই রাজত্বকালে বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে থাকে এবং খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দে মুসলমান আক্রমণের পর হইতে একেবারে ঐ ধর্ম্ম এই দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়।

ইহার পর মগধ হইতে বিতাড়িত বহু ভিক্ষু সম্প্রদায় দক্ষিণ প্রদেশে আগমনপূর্ব্বক কিছু কালের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যানগর, কলিঙ্গ এবং কঙ্কণ প্রদেশে বহু বৌদ্ধ বিহার এবং সংঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। দাম্বাল নামক স্থানে যে বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সময়ে ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে কিছুকালের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কাশ্মীর প্রদেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৯৫০ হইতে ৯৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত ক্ষেমগুপ্তের রাজত্বকালে এবং ১০৮৮ হইতে ১১০৩ পর্য্যন্ত শ্রীহর্ষের রাজত্বকালে কাশ্মীর প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম যে নৃপতিগণের ন্যায় প্রজাবর্গেরও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে সাহমীর কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন, এই সময় হইতে কাশ্মীরে ইস্‌লামধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে অন্তর্হিত হয়। বঙ্গদেশেও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশীয় কোন রাজকুমার গয়াধামে বহু বৌদ্ধ বিহারের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপে উড়িষ্যাতেও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিছুদিনের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্র নামক নরপতির রাজত্বকালে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতেও যবন সম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছিল। এইভাবে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ শেষে নেপাল দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নেপালের নরপতিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করিতেন না, এই কারণে এখনও পর্য্যন্ত সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি না হইলেও কথঞ্চিৎ অবস্থিতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এখনও নেপালে অগণিত বৌদ্ধস্তূপ এবং অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার দেখিতে পাওয়া যায়।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ সূত্র ২৯ ॥

পদচ্ছেদ। অভিব্যক্তেঃ ইতি আশ্মরথ্যঃ।

অন্বয়। (পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বং) অভিব্যক্তেঃ (উপপদ্যতে) ইতি আশ্মরথ্যঃ (আহ)।

অনুবাদ। (পরমেশ্বর নিরতিশয় পরিমাণ হইলেও) অভিব্যক্তি হয় বলিয়া (তাঁহাকে প্রাদেশপরিমিত বলা যাইতে পারে) ইহা আশ্মরথ্য বলিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য। কথং পুনঃ পরমেশ্বরপরিগ্রহে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ উপপদ্যতে ইতি তাং ব্যাখ্যাতুং আরভতে। অতিমাত্রস্যাপি পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বমভিব্যক্তিনিমিত্তং স্যাৎ। অভিব্যজ্যতে কিল প্রাদেশমাত্র-পরিমাণঃ পরমেশ্বর উপাসকানাং কৃতে। প্রদেশেষু বা হৃদয়াদিষূপলব্ধি স্থানেষু বিশেষেণাভিব্যজ্যতে। অতঃ পরমেশ্বরেঽপি প্রাদেশমাত্রশ্রু-তিরভিব্যক্তেরুপপদ্যত ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রাদেশমাত্র পরিমাণ বলিয়া যে শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, সেই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ—পরমেশ্বর হইতে পারেন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? এই প্রকার যদি কেহ আশঙ্কা করে, তবে তাহার নিরাকরণ করিবার জন্য সেই শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন। পরমেশ্বর নিরতিশয় পরিমাণ হইলেও, তাঁহাকে শ্রুতি যে প্রাদেশ পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ ইহাই হইতে পারে যে, তিনি প্রাদেশমাত্র পরিমাণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ উপাসকগণের (চিত্তশুদ্ধির) জন্য তিনি প্রাদেশমাত্র পরিমাণযুক্তরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। অথবা প্রাদেশ শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টদেশ অর্থাৎ ভগবানের উপলব্ধি স্থানস্বরূপে হৃদয় প্রভৃতি যে সকল প্রদেশ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল প্রদেশে তিনি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, এই কারণে ঐ শ্রুতি পরমেশ্বরকে প্রাদেশ প্রমাণ বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা অভিব্যক্তি নিমিত্ত উপপন্ন হইতে পারে, ইহা আশ্মরথ্য নামে আচার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ॥ সূত্র ৩০ ॥

পদচ্ছেদ। অনুস্মৃতেঃ, বাদরিঃ।

অন্বয়। (পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বং) অনুস্মৃতেঃ (উপপদ্যতে ইতি) বাদরিঃ (মন্যতে)।

অনুবাদ। পরমেশ্বরকে প্রাদেশমাত্র পরিমাণ বলিয়া শ্রুতিতে যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতে পারে, কারণ প্রাদেশমাত্র পরিমাণ যে মন সেই মনের দ্বারা তিনি অনুস্মৃত হইয়া থাকেন, ইহা বাদরি নামে আচার্য্য বলিয়া থাকেন।

ভাষ্য। প্রাদেশমাত্রহৃদয়প্রতিষ্ঠেন বাঽয়ং মনসাঽনুস্মর্য্যতে তেন প্রাদেশমাত্র ইত্যুচ্যতে। যথা প্রস্থমিতা যবাঃ প্রস্থা ইত্যুচ্যন্তে তদ্বৎ। যদ্যপি চ যবেষু স্বগতমেব পরিমাণং প্রস্থসম্বন্ধাদ্ব্যজ্যতে। নচেহ পরমেশ্বরগতং কিঞ্চিৎপরিমাণমস্তি যদ্ধৃদয়সম্বন্ধাদ্ব্যজ্যেত। তথাঽপি প্রযুক্তায়াঃ প্রাদেশমাত্রশ্রুতেঃ সম্ভবতি যথাকথঞ্চিদনুস্মরণমালম্বনমিত্যুচ্যতে। প্রাদেশমাত্রত্বেন বাঽয়মপ্রাদেশমাত্রোঽপ্যনুস্মরণীয়ঃ প্রাদেশমাত্র শ্রুত্যর্থবত্তায়ৈ। এবমনুস্মৃতিনিমিত্তা পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ। হৃদয়—প্রাদেশ পরিমাণ, সেই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত যে মন নামে প্রসিদ্ধ অন্তঃকরণ, তাহা দ্বারা ভগবান অনুস্মৃত হয়েন, সেই কারণে তিনিও প্রাদেশমাত্র বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন। যেমন এক প্রস্থ (পরিমাণ বিশেষ) দ্বারা পরিমিত যে যবসমূহ তাহাকেও প্রস্থ বলা যায় সেইরূপ; যদ্যপিও যবসমূহে যে পরিমাণ আছে, তাহাই প্রস্থের সহিত সম্বন্ধ হওয়া প্রযুক্ত অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, এই প্রকৃত স্থলে কিন্তু পরমেশ্বরে কোন প্রকার পরিমাণ নাই, যাহা প্রস্থস্থলাভিষিক্ত হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়া নিবন্ধন অভিব্যক্ত হইতে পারে। তথাপি উল্লিখিত প্রাদেশমাত্র শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে যে কোন প্রকারে তাঁহার অনুস্মৃতি হইয়া থাকে, তাহাই আলম্বনরূপে উক্ত হইয়াছে। ইনি প্রাদেশমাত্র না হইলেও প্রাদেশমাত্ররূপে অনুস্মরণের যোগ্য (অর্থাৎ সেই ভাবে তাঁহারা অনুস্মরণ করিলে শুভাদৃষ্টাদি হইবে), ইহা প্রাদেশমাত্র শ্রুতির সার্থক্য সম্পাদনের জন্য কল্পনা করিতে হইবে, এইভাবে

পরমেশ্বরে অনুস্মৃতি নিমিত্ত প্রাদেশমাত্র শ্রুতি উপপন্ন হইতে পারে, ইহা বাদরি নামে প্রসিদ্ধ আচার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩১ সূত্র ॥

পদচ্ছেদ। সম্পত্তেঃ, ইতি, জৈমিনিঃ, তথা, হি, দর্শয়তি।

অন্বয়। (পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বং) সম্পত্তেঃ (উপপদ্যতে) ইতি জৈমিনিঃ (মন্যতে) তথাহি। (সঃ) দর্শয়তি।

অনুবাদ। (পরমেশ্বর নিরতিশয় প্রমাণ হইলেও তাঁহাকে প্রাদেশ প্রমাণ বলিয়া ভাবিয়া লইতে হইবে এই প্রকার ভাবিয়া লওয়ার নামই সম্পত্তি, এইরূপ) সম্পত্তি নিমিত্ত (পরমেশ্বরকে প্রাদেশমাত্র পরিমাণ বলিয়া উক্ত শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে) ইহা জৈমিনি আচার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন (এবং) তিনি (সেই ভাবে অন্য শ্রুতিকে নিদর্শনস্বরূপে) দেখাইয়াও থাকেন।

ভাষ্য। সম্পত্তিনিমিত্তা বা স্যাৎপ্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ। কুতঃ। তথাহি সমানপ্রকরণং বাজসনেয়িব্রাহ্মণং দ্যুপ্রভৃতীন্পৃথিবীপর্য্যন্তান্‌ ত্রৈলোক্যাত্মনো বৈশ্বানরস্যাবয়বানধ্যাত্মমূর্ধপ্রভৃতিষু চুবুকপর্য্যন্তেষু দেহাবয়বেষু সম্পাদয়ৎ প্রাদেশমাত্রসম্পত্তিং পরমেশ্বরস্য দর্শয়তি। প্রাদেশমাত্রমিব হ বৈ দেবাঃ সুবিদিতা অভিসম্পন্নাস্তথা তু ব এতান্বক্ষ্যামি যথা প্রাদেশমাত্রমেবাভিসম্পাদয়িষ্যামীতি। স হোবাচ মূর্ধানমুপদিশন্নুবাচৈষ বা অতিষ্ঠা বৈশ্বানর ইতি। চক্ষুষী উপদিশন্নুবাচৈষ বৈ সুতেজা বৈশ্বানর ইতি। নাসিকে উপদিশন্নুবাচৈষ বৈ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানর ইতি। মুখ্যমাকাশমুপদিশন্নুবাচৈষ বৈ বহুলো বৈশ্বানর ইতি। মুখ্যা অপ উপদিশন্নুবাচৈষ বৈ রয়ির্বৈশ্বানর ইতি। চুবুকমুপদিশন্নুবাচৈষ বৈ প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর ইতি। চুবুকমিত্যধরং মুখফলকমুচ্যতে। যদ্যপি বাজসনেয়কে দ্যৌরতিষ্ঠাত্বগুণা সমাম্নায়ত আদিত্যশ্চ সুতেজস্ত্বগুণঃ। ছান্দোগ্যে পুনর্দ্যৌঃ সুতেজস্ত্বগুণা সমাম্নায়ত আদিত্যশ্চ বিশ্বরূপত্বগুণঃ। তথাহপি নৈতাবতা বিশেষেণ কিঞ্চিদ্ধীয়তে প্রাদেশমাত্রশ্রুতেরবিশেষাৎ।

সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ত্বাচ্চ। সম্পত্তিনিমিত্তাং প্রাদেশমাত্রশ্রুতিং যুক্ততরাং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রাদেশমাত্র শ্রুতি সম্পত্তি নিমিত্ত উপপন্ন হইতে পারে। কি প্রকারে (তাহা বলা যাইতেছে) বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণেও এইরূপ প্রকরণের সাম্য আছে। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে দ্যুলোক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত লোকত্রয় যে পরমেশ্বরে অধিষ্ঠিত, এবং সেই পরমেশ্বরকে বৈশ্বানর-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার অবয়ব সমূহরূপে মস্তক হইতে চুবুক (চিবুক) পর্য্যন্ত যে সকল দেহাবয়বের সম্পাদন করা হইয়াছে, সেই সম্পাদন প্রসঙ্গে পরমেশ্বরকে প্রাদেশমাত্ররূপে সম্পাদন করা অর্থাৎ ভাবনা করার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শ্রুতিতে এই ভাবে উল্লেখ আছে যে, দেবগণ যেন প্রাদেশমাত্র পরিমাণরূপে সুবিদিত এবং তদ্রূপেই তাঁহারা অভিধ্যাত হইয়া থাকেন, এই কারণে তোমাদিগকে এই দেবতাসমূহ বিষয়ে সেইরূপই বর্ণন করিব, যাহা দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে প্রাদেশমাত্র পরিমাণরূপে তোমাদিগের জ্ঞানের গোচর করাইব। তখন তিনি বলিলেন যে, দেখ, এই যে পরমেশ্বরের মস্তক ইহাই হইল অতিষ্ঠা—ইহাকেই বৈশ্বানর বলা যায়। পরমেশ্বরের চক্ষুর্দ্বয়কে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, ইহাই হইল সুতেজা—ইনিই বৈশ্বানর। তাঁহার নাসিকাদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, ইহাই হইল পৃথক বর্ত্মা—ইনিই আত্মা—ইনিই বৈশ্বানর। পরমেশ্বরের মুখপরিমিত আকাশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, ইহাই বহুল—ইনিই বৈশ্বানর। পরমেশ্বরের মুখমধ্যে যে জল সমূহ বিদ্যমান আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, ইহার নাম রয়ি (অর্থাৎ ধন) ইনিই বৈশ্বানর। তাঁহার চুবুককে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, ইহাই প্রতিষ্ঠা—ইহাই বৈশ্বানর। চুবুক শব্দের অর্থ মুখের নিম্নভাগ যাহাকে মুখফলক বলা যায়। যদিও উক্ত বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে দ্যুলোকের অতিষ্ঠাত্বরূপ গুণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং আদিত্যের সুতেজস্ত্বগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে দ্যুলোকের সুতেজস্ত্বগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আদিত্যের বিশ্বরূপত্বগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, (এইভাবে উভয় শ্রুতিতে আপাততঃ বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও) তথাপি শ্রুতিদ্বয় মধ্যে পরস্পর এইরূপ বৈলক্ষণ্যের নির্দ্দেশ থাকিলেও কিছু হানি হয় নাই; কারণ উভয় শ্রুতিতেই একই ভাবে তাঁহার প্রাদেশমাত্ররূপতা নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে। বেদের সকল শাখাতে এই প্রকারই প্রতীত হইয়া থাকে, সুতরাং প্রাদেশমাত্র শ্রুতি যে সম্পত্তি নিমিত্ত এবং সেইভাবে ব্যাখ্যা করিলেই উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যাও যুক্তিযুক্ত হয়; ইহা জৈমিনি আচার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ সূত্র ৩২ ॥

পদচ্ছেদ। আমনন্তি, চ, এনম্, অস্মিন্।

অন্বয়। এনং (পরমেশ্বরম্) অস্মিন্ (মূর্দ্ধাদিদেশে জাবালাঃ) আমনন্তি (স্মরন্তি) চ।

সূত্রানুবাদ। এই পরমেশ্বরকে (পূর্ব্বোক্ত) এই স্থানে (অর্থাৎ মস্তক এবং চুবুকের অন্তরাল প্রদেশে জাবালগণ) স্মরণ করিয়া থাকেন।

ভাষ্য। আমনন্তি চৈনং পরমেশ্বরমস্মিন্মূর্ধচুবুকান্তরালে জাবালাঃ। য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি। সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাস্যাং চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাসীতি। তত্র চেমামেব নাসিকাং বরণা নাসীতি নিরুচ্য চ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তীতি সা বরণা সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি নাশয়তীতি সা নাসীতি পুনরামনন্তি। "কতমং চাস্য স্থানং ভবতীতি ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এষ দ্যুলোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতি" ইতি। তস্মাদুপপন্না পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ। অভিবিমানশ্রুতিঃ প্রত্যগাত্মত্বাভিপ্রায়া। প্রত্যগাত্মতয়া সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিরভিবিমীয়ত ইত্যভিবিমানঃ। অভিগতোবাঽয়ং প্রত্যগাত্মত্বাদ্বিমানশ্চ মানবিয়োগাদিত্যভিবিমানঃ। অভিবিমিমীতে বা সর্ব্ব-জগৎকারণত্বাদিত্যভিবিমানঃ। তস্মাৎ-পরমেশ্বরো বৈশ্বানর ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্কর ভাগবৎ পূজ্যপাদ
কৃতৌ প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয় পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ। এই স্থানে অর্থাৎ মস্তক এবং চুবুকের মধ্য প্রদেশে জাবালগণ এই পরমেশ্বরকে (এই ভাবেই) স্মরণ করিয়া থাকেন। (কারণ জাবাল শ্রুতিতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে যে) এই যে অনন্ত অব্যক্ত আত্মা

তিনি অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেই অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত? বরণা এবং নাসী এই উভয়ের মধ্যে সেই অবিমুক্ত প্রতিষ্ঠিত। বরণা কাহাকে বলে এবং কাহাকে নাসী বলে? ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে (পরে) এই নাসিকাকে বরণা এবং নাসী এই দুই শব্দের অর্থরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপকে নিবারণ করে বলিয়া সেই নাসিকা "বরণা" এই শব্দের বাচ্য, এই প্রকারে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপকে নষ্ট করে বলিয়া সেই নাসিকাই "নাসী" এই শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। এইভাবে বরণা এবং নাসী এই শব্দের এইরূপ নির্ব্বচন করিয়া সেই জাবাল শ্রুতি বলিতেছে যে, "ইহার কোন্ স্থান হইয়া থাকে? ভ্রূদ্বয় এবং নাসিকার সন্ধিস্থল তাহাই এই দ্যুলোক এবং তৎপরবর্ত্তী লোকের সন্ধিস্থান হইয়া থাকে ইত্যাদি" এই কারণে বলিতে হইবে যে, পরমেশ্বরকেই বুঝাইবার জন্য যে প্রাদেশ শ্রুতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত। অভিবিমান শ্রুতিও পরমাত্মাকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সকল প্রাণী তাঁহাকে নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া অভিবিমান অর্থাৎ বিবেচনা করে, এই কারণে সেই পরমাত্মা অভিবিমান শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়া থাকেন, অথবা এই পরমাত্মা সর্ব্বত্রই অভিগত এবং বিমান অর্থাৎ অভিমানরহিত কিম্বা মান রহিত—পরিচ্ছেদাতীত, এই কারণে সেই পরমাত্মা অভিবিমান এই শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়া থাকেন। অথবা কারণস্বরূপে যিনি সকল জগতকে ব্যাপিয়া রাখিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরই অভিবিমান শব্দের অর্থ; সেই কারণে প্রকৃতস্থলে পরমেশ্বরই যে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ ইহাই সিদ্ধ হইল।

ইতি পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবানের প্রণীত শারীরক ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

প্রথম অধ্যায়।
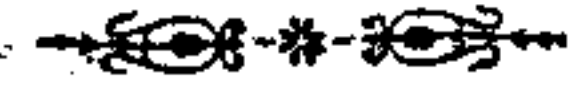
তৃতীয় পাদ।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ সূত্র ১ ॥

পদচ্ছেদ। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং (দ্যু ভূ আদি আয়তনং) স্বশব্দাৎ।

অন্বয়। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং (ব্রহ্মৈব ভবতি) স্বশব্দাৎ (তদ্‌বোধক শব্দ সদ্ভাবাৎ ইত্যর্থঃ)।

সূত্রানুবাদ। দ্যুলোক এবং ভূপ্রভৃতি লোকের আয়তন ব্রহ্মই (ইহা জানিতে হইবে) কারণ ব্রহ্মেরই বোধক শব্দ আছে।

ভাষ্য। ইদং শ্রূয়তে "যস্মিন্দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইতি (মুং ২।২।৫)। অত্র যদেতদ্দ্যুপ্রভৃতীনামোতত্ববচনাদায়তনং কিঞ্চিদবগম্যতে তৎকিং পরংব্রহ্ম স্যাদাহোস্বিদর্থান্তরমিতি সন্দিহ্যতে। তত্রার্থান্তরং কিমপ্যায়তনং স্যাদিতি প্রাপ্তম্। কস্মাৎ। অমৃতস্যৈষ সেতুরিতি শ্রবণাৎ। পারবান্‌হি লোকে সেতুঃ প্রখ্যাতঃ। নচ পরস্য ব্রহ্মণঃ পারবত্ত্বং শক্যমভ্যুপগন্তুম্ "অনন্তমপারং" (বৃ ২।৪।১২) ইতি শ্রবণাৎ। অর্থান্তরে চাহয়তনে পরিগৃহ্যমাণে স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানং পরিগ্রহীতব্যং তস্য কারণত্বাদায়তনত্বোপপত্তেঃ। শ্রুতিপ্রসিদ্ধো বা বায়ুঃ স্যাৎ। "বায়ুর্ব্বৈগৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি" (বৃং ৩।৭।২) ইতি বায়োরপি বিধারণত্বশ্রবণাৎ। শারীরো বা স্যাৎ। তস্যাপি ভোক্তৃত্বাদ্ভোগ্যং প্রপঞ্চং প্রত্যায়তনত্বো-

পপত্তেরিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ। দ্যুভ্বাদ্যায়তনমিতি। দ্যৌশ্চ ভূশ্চ দ্যুভুবৌ দ্যুভুবাবাদী যস্য তদিদং দ্যুভ্বাদি। যদেতদস্মিন্বাক্যে দ্যৌঃ পৃথিব্যন্তরিক্ষং মনঃ প্রাণা ইত্যেবমাত্মকং জগদোতত্বেন নির্দিষ্টং তস্যাঽয়তনং পরং ব্রহ্ম ভবিতু মর্হতি। কুতঃ। স্বশব্দাদাত্মশব্দাদিত্যর্থঃ। আত্মশব্দোহীহ ভবতি। তমেবৈকং জানথ আত্মানমিতি। আত্মশব্দশ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে সম্যগবকল্পতে নার্থান্তরপরিগ্রহে। ক্বচিচ্চ স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মণ আয়তনত্বং শ্রূয়তে "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" ইতি (ছাং ৬।৮।৪) স্বশব্দেনেব চেহ পুরস্তাদুপরিষ্টাচ্চ ব্রহ্ম সংকীর্ত্ত্যতে "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্" ইতি "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ" ইতি চ (মুং ২।২।১১)। তত্র ত্বায়তনায়তনবদ্ভাবশ্রবণাৎ। সর্ব্ব ব্রহ্মেতি চ সামানাধিকরণ্যাৎ। যথাঽনেকাত্মকো বৃক্ষঃ শাখা স্কন্ধো মূলং চেত্যেবং নানারসো বিচিত্র আত্মেত্যাশঙ্কা সম্ভবতি তাং নিবর্ত্তয়িতুং সাবধারণমাহ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমিতি। এতদুক্তং ভবতি। ন কার্য্যপ্রপঞ্চ-বিশিষ্টো বিচিত্র আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ। কিন্তর্হ্যবিদ্যাকৃতং কার্য্যপ্রপঞ্চং বিদ্যয়া প্রবিলাপয়ন্তস্তমেবৈকমায়তনভূতমাত্মানং জানথৈকরসমিতি। যথা যস্মিন্নাস্তে দেবদত্তস্তদানয়েত্যুক্তে আসনমেবাঽনয়তি ন দেবদত্তম্। তদ্বদায়তনভূ-তস্যৈকৈকরসস্যাঽত্মনো বিজ্ঞেয়ত্বমুপদিশ্যতে। বিকারানৃতাভিসংধস্য চাপবাদঃ শ্রূয়তে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (কাং ২।৪।১১) ইতি। সর্ব্ব ব্রহ্মেতি তু সামানাধিকরণ্যং প্রপঞ্চ বিলাপনার্থং নানেকরসতাপ্রতিপাদনার্থম্। "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽ-বাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্ন প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃং ৪।৫।১৩) ইত্যেকরসতাশ্রবণাৎ। তস্মাদ্-দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্ম। যত্তুক্তং সেতুশ্রুতেঃ সেতোশ্চ পারবত্ত্বোপপত্তে-র্ব্রহ্মণোঽর্থান্তরেণ দ্যুভ্বাদ্যায়তনেন ভবিতব্যমিতি। অত্রোচ্যতে। বিধারণত্বমাত্রমেব সেতুশ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে ন পারবত্ত্বাদি। নহি মৃদ্দারুময়ো

in vite the attention of the reader of the book to the piece Trimurti, Menoka Triveni, Amba's address to Salya of manys portions of Kavi-o-Kabya which are really beautiful and deserving of special mention. We congratulate the author on the success of his maiden attempt in the field of poetry and wish him a happy future.

নব্যভারত বলেন—

রামসহায় বাবু একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, তিনি যে কাজে হাত দেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হন। কবি ও কাব্য কবিতায় মহাভারত হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান কবিগণের কথা বিবৃত হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের কবিত্বের পরিচয় পাইলাম।

ব্রাহ্মণ সমাজ বলেন—

রস আছে, ভাব আছে, ভাষা আছে; যে গুণে কবিতা কাব্য নামের উপযুক্ত, বহু স্থানেই সে গুণ আছে। নব নব কুসুমে মাতৃভাষায় সরস্বতীর অর্চ্চনায় সিদ্ধি লাভ করুন।

হিন্দু পত্রিকা বলেন—

প্রতিভার পরিচয় যথেষ্ট প্রচুর। পণ্ডিত রামসহায় ভাবুক লেখক, এবারে তিনি বাঙ্গালার কবিরূপে বাণী মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত। আমরা সমস্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

অর্চ্চনা বলেন—

কবি ও কাব্য নামক কাব্যে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সম্বন্ধে মনোরম কবিতা লিখিয়াছেন। লেখক বেশ গুণপণার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এ গ্রন্থ পাঠে বড় প্রীত হইয়াছি।

সম্মিলনী বলেন—

সরল সহজ মধুর ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ; কোথাও কোথাও মৌলিক ভাবের উচ্ছ্বাস। উপযুক্ত ভাবদ্যোতক শব্দ যোজনায় সুশ্রাব্য হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়গ্রাহী এই গ্রন্থ।

জন্মভূমি বলেন—

পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে মাধুরী ঝরিতেছে।

কাজের লোক বলেন—

এখানি খণ্ডকাব্য, সৌরভে প্রাণ মাতোয়ারা করিতে পারে, এমনি পুষ্পেই মালঞ্চ পরিপূর্ণ। দেশের কবি ও কাব্যের এবং অন্যান্য বিষয়ের এমন ভাবময় সমালোচনার কাব্য ইতিপূর্ব্বে কখন পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! আধুনিক যে সকল কবিতা জন সমাজে প্রচারিত হইতেছে, মালঞ্চ নিশ্চয়ই তাহাদের শীর্ষস্থানে স্থান পাইবার উপযুক্ত।

মেদিনীপুর হিতৈষী। ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর। প্রতি কবিতায় লেখকের প্রাণ ও বৈচিত্র্য পরিস্ফুট।

বিদূষক বলেন—

পুস্তকের মালঞ্চনাম সার্থক হইয়াছে। মালঞ্চস্থ কবিতা কুসুমের ঘ্রাণে স্বতঃই প্রাণ মাতুয়ারা হইয়া উঠে। মালঞ্চে কিংশুক নাই; সকলগুলিই চম্পক গোলাপ বেলা গন্ধরাজ। রসিক জনে এরস উপভোগ করুন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত

অবকাশ।

এইরূপ সন্দর্ভ পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। গল্পচ্ছলে বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি ইহাতে যেমন সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ সংস্কৃত সাহিত্যের সার রত্নগুলি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মক্লিষ্ট বাঙ্গালী জীবন, যাঁহারা একাধারে কাব্য ও ধর্ম্মের রসাস্বাদন করিতে চাহেন তাঁহাদের এই পুস্তক একবার পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। ডাকমাশুল ও ভি পি ৵০ আনা। এই পুস্তকখানিরও অসংখ্য প্রশংসাপত্র আছে।

পণ্ডিত রাম সহায়ের আর একখানি

নূতন পুস্তক

অধ্যাত্মবাদ

যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা।